তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত

সংকলন

প্রেমময় দাশগুপ্ত



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা * * * ১৯৮১

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৮১

মুদ্রাকর :
অরুণ কুমার পাইন
আরিন্ প্রিণ্টার্স
৫১/১/১ সিকদার বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৪

আমাদের কথা

'বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ' গ্রন্থমালার ষষ্ঠ গ্রন্থ "তিব্বতী পরিব্রাজকদের দেখা ভারত"। এই গ্রন্থে লেখক তিনজন বিখ্যাত তিব্বতীয় পরিব্রাজকের কথা বিবৃত করেছেন—যাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের নিজ নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত যা' তথ্য-সন্ধানী ইতিহাস-জিজ্ঞাসু ছাত্রদের যথেষ্ট উপকারে আসবে আশা রাখি। সাধারণ পাঠকও এই বই পাঠে আনন্দ পাবেন। আগের গ্রন্থগুলি পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। আশা করি এটিও অনুরূপ সাড়া জাগাবে। পরবর্তী গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশিত হবে।

প্রকাশক

সূচীপত্র

অরগ্যান পা' ১

সিদ্ধ রগদ তসঙ পা' ৪৭

স্তাগ তসঙ রস পা' ৬২

শব্দসূচী ৯৭

মানচিত্র

অরগ্যান-পা'

অবশেষে গ্‌দন-দমর এসে গেলেন পাঁচ জনে।

অরগ্যান-পা', দ্‌পল ইয়ে আর তাদের তিন সঙ্গী।

গ্‌দন-দমর শহরটি তিব্বতের পশ্চিম প্রদেশ পু্‌রঙস-এর পূব সীমানায়। প্রদেশটির আধুনিক নাম তকলাকোট।

এখান থেকে ম-পম বা মান সরোবর আর মাত্র একবেলার পথ। উত্তেজনায় তীর্থযাত্রীরা যেন সব ক্লান্তি ভুলে গেলেন।

যাত্রী তারা ক'জনেই শুধু নন। আরো অনেক লোক। প্রায় পাঁচশো জনের এক বিরাট দল। মেয়ে পুরুষ দুই-ই রয়েছে। আছে গৃহী আর সন্ন্যাসী। তীর্থযাত্রী ও বণিক। সন্ন্যাসী বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যাই অবশ্য সব থেকে বেশি। প্রায় সকলেই ব্‌কর গুদ পা' সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু। চলতি তিব্বতী ভাষায় এদের নাম রস পা'। মানে, সূতীর পোষাক পরা লোক।

অরগ্যান-পা', দ্‌পল ইয়ে এবং তাদের তিন সঙ্গীও বৌদ্ধ ভিক্ষু। তবে ওই সম্প্রদায়ের নন। সকলেই তারা তান্ত্রিক-বৌদ্ধ।

দলের মধ্যে একমাত্র তারা পাঁচজনই দূর তীর্থ যাত্রী। চলেছেন ভারতের উড্ডীয়ান বা উদ্যান দেশে। তিব্বতী ভাষায় উরগ্যান বা অরগ্যান।

অরগ্যান-পা'-র আসল নাম অবশ্য অন্য। তবে সে নামটি কী ছিল তা আজ আর জানার উপায় নেই। উদ্যান বা অরগ্যান দেখে দেশে ফিরে যাবার পর তিনি অরগ্যান-পা' বা অরগ্যান দেখে ফেরা লোক হিসাবে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। আসল নামটি এই নতুন নামের প্রচারে কোথায় তলিয়ে গেছে।

যে অঞ্চলটিতে তারা এখন রয়েছেন সেটি সাগর পৃষ্ঠ থেকে ১৪,৫০০ ফুট উঁচুতে। পুরো পাহাড়ী এলাকা। সূর্য কখনো উগ্র হবার

সুযোগ পায় না এখানে। বেশির ভাগ সময়েই কুয়াশার আস্তরণের মধ্য দিয়ে আলোর নম্র আভাস। এ অঞ্চলে ১৮,৫০০ ফুটের কাছাকাছি থেকে অবিরাম তুষার পাতের এলাকা।

দিনের সংকেত ফুটে উঠতেই যাত্রীরা রওনা হলো। দু'পাশে খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়। মাঝে একেবেঁকে উঁচু-নীচু সংকীর্ণ পথরেখা। পথ না বলে গিরিখাত বলাই বোধহয় ঠিক। সে পথও আবার উঁচু থেকে ক্রমশ আরো উঁচুতে উঠে গেছে। কোথাও কোথাও সে পথও আবার বিচ্ছিন্ন। দড়ির ঝুলন্ত সেতু দিয়ে সংযোগ করা হয়েছে।

সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে যাত্রীরা। দু'পাশের বিশাল পাহাড়ের পটভূমিকায় তাদের দিকে তাকালে মনে হবে যেন বিরাট লম্বা একসার পিঁপড়ে এগিয়ে চলেছে। তিব্বতীরা দ্রুত হাঁটার ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত। আসলে, তিব্বতের হিমেল আবহাওয়ায় শরীর গরম রাখতে হলে দ্রুত না হেঁটে উপায় নেই। তাই দ্রুত অথচ সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে যাত্রীরা।

ঘণ্টা ছ'য়েক টানা পথ চলার পর উল্লাসের গুঞ্জন দেখা দিলো যাত্রীদের মধ্যে। মুখে ক্লান্তি মুছে দেয়া সাফল্যের হাসি। সামনেই তুষাররাজ তি-সে বা কৈলাস পর্বতের উত্তর দুয়ার। আর একটু এগোলে ম-পম বা মান সরোবর।

পাঁচশো কণ্ঠে কৈলাস আর মান সরোবরের অপার মহিমা ও জয়ধ্বনি উচ্চকিত হলো। ধ্বনিত হলো পরম কারুণিক বুদ্ধের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

সরোবর কূলে পৌঁছে রস-পা'রা প্রার্থনার আয়োজন করলেন। সকলে হাঁটু গেড়ে বসে সে প্রার্থনায় যোগ দিলেন। অরগ্যান-পা' এবং তার সাথীরাও তাদের সঙ্গে সে প্রার্থনার সুরে সুর মেলালেন। প্রার্থনা শেষ হতে প্রণতি জানিয়ে সকলে সরোবরেরপবিত্র জল মাথায় ছোঁয়ালেন, পান করলেন।

সাগর রেখা থেকে ১৪,৯৫০ ফুট উঁচুতে বিরাট এলাকা জুড়ে এই সরোবর। পূর্বে-পশ্চিমে ১২ মাইল, উত্তর-দক্ষিণে ১৪ মাইল। এর উত্তর দিকে কৈলাস পর্বত ; দক্ষিণে গুরলা মান্ধাতা। কৈলাসের উচ্চতা ২২,০২৮ ফুট। শতদ্রু নদী এই মান সরোবর ও এর কাছে থাকা রকস সরোবর থেকে জন্ম নিয়েছে।

সে দিনটি সরোবরের কূলেই কাটলো। সকলে বিশ্রাম নিলেন, ঘুমোলেন। কেউ কেউ পূজা অর্চনাও করলেন।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হলো। যারা এখান থেকেই ফিরে যাবেন তারা রইলেন। যারা ভারত-যাত্রী তারা এবার ভারতের পথ ধরে সেদিকে এগিয়ে চললেন। চলেছেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে সদলে অরগ্যান-পা'ও।

এতদিন চড়াই ভাঙতে হয়েছে। এবার বেশির ভাগ উৎরাইয়ের পথ। গতি তাই আগের চেয়ে দ্রুত। তান্ত্রিক যোগ-সাধনায় অভ্যস্ত ভিক্ষুর দল প্রায় ছুটে চলেছেন। সাতদিনের পথ একদিনে পার হবেন এরকম এক সংকল্প। পাহাড়ী পথ। একটু অসতর্ক হলেই ব্যস, আর রক্ষা নেই। তাই পথের দিকে সতর্ক চোখ রেখে পা ফেলে চলেছেন সবাই।

এরকম একটানা ছুটে চলার ক্ষমতা লাভের জন্য যারা যোগাভ্যাস করেন তাদের রলুঙ-পা' বলে তিব্বতে। অরগ্যান-পা', ও তার সাথীরা এ ধরনের যোগাভ্যাস করেছেন। তাই এ রকম দ্রুত চলার জন্য তারা কোনরকম ক্লান্তি বা দৈহিক কষ্টবোধ করছেন না। মনও তাদের ফুলের মতো তাজা।

চলতে চলতে একদিন তারা পার্বত্য পাঞ্জাবের বা আধুনিক হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যকায় এলেন। ভারতের যে ২৪টি তন্ত্র পীঠ বা মহাস্থানকে নিয়ে তিব্বতে বজ্রকায়ের কল্পনা করা হয়েছে কুলু তার একটি। ২৪ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মধ্যে এটি হলো বজ্রকায়ের হাঁটু।

কুলু পিছনে ফেলে এরপর তারা চলতে শুরু করলেন মরু দেশের

দিকে। এটি সম্ভবতঃ ছাম্ব উপত্যকা। এটি তন্ত্রের আর একটি পীঠ। বজ্রকায়ের পায়ের আঙুল।

মান সরোবর থেকে কতক ভারতীয় যাত্রীও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। মেয়ে পুরুষ দুই-ই আছে তার মধ্যে। এর মধ্যে একটি মেয়ের নাম ক্ষেত্রপাল। পরনে ভিক্ষুণীর বেশ।

নিজে থেকে এগিয়ে এসেই সে আলাপ করে অরগ্যান-পা'র সাথে। নামটিও শুনিয়ে দেয়।

বয়স মেয়েটির কতো ঠিক অনুমান করে উঠতে পারেনি অরগ্যান-পা'। মনে হলো খুব বেশি নয়। তিরিশের নিচেই হবে হয়তো। অন্ততঃ তার নিজের চেয়ে যে ছোট হবে এতে কোন ভুল নেই।

ক্ষেত্রপালের এরকম গায়ে পড়ে আলাপ করাকে মোটেই সহজ ভাবে নিতে পারেনি অরগ্যান-পা'। মেয়েটা দেখতে খুব খারাপ না হলেও এখন ওকে মোটেই সুশ্রী দেখাচ্ছিল না। ঠাণ্ডা লেগে নাকে একটা ক্ষত হয়েছে। সেজন্য সমস্ত মুখটা ফুলে গিয়ে চোখ মুখের চেহারা কেমন যেন অদ্ভুত রূপ নিয়েছে।

ওকে দেখেই অরগ্যান-পা'র মন বলে উঠেছে, ও নিশ্চয় এক দুষ্ট প্রকৃতির ডাকিনী। মেয়েটা যেচে আলাপ করার পর এ বিশ্বাস আরো গাঢ় হয়েছে। ওর মনে নিশ্চয়ই কোন ভয়ংকর উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে।

ভারত হলো তন্ত্রের দেশ। তন্ত্রপীঠের মধ্য দিয়ে চলেছে সে। এখানে ঘরে ঘরে ডাকিনী যোগিনী। ছেলেবেলা থেকে সে একথা শুনে এসেছে। বইতে পড়েছে। তন্ত্রের বইতে ডাকিনীদের কতো কীর্তিকলাপ, নানা বুক কাঁপানো ভয়ংকর ক্ষমতার কথা লেখা আছে। কী না করতে পারে তারা! ইচ্ছে করলে যে কোন প্রাণীর রূপ ধরতে পারে। যে কোন লোককে যে কোন প্রাণী বানিয়ে দিতে পারে। শুধু দৃষ্টি দিয়ে ওরা তোমার বুকের হৃৎপিণ্ড খেয়ে নিতে পারে। তুমি জানতেও পারবে না। জানবার জন্য তুমি বেঁচে থাকলে তো!

অরগ্যান-পা' নিজে অবশ্য ভালো তন্ত্র জানে। চাইলেই একটা ডাকিনী ওর হৃৎপিণ্ডটা খেয়ে ফেলতে পারবে না। ওকে গরু ভেড়া কিংবা কোন কিম্ভূত কিমাকার জন্তু জানোয়ার বানিয়ে দিতে পারবে না। এসব ঠেকানোর মন্ত্র অরগ্যান-পা'র জানা আছে।

তবু অরগ্যান-পা' পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারে না। যতোই হোক এরা হলো খোদ তন্ত্রের দেশের মেয়েমানুষ। ওদের ক্ষমতা অনেক বিরাট হতে পারে। হয়তো ওদের ক্ষমতার কাছে তার ক্ষমতা, তার তন্ত্র-মন্ত্র কিছুই কাজ করবে না। তখন ?

তখন কী হবে সেকথা ভাবতে গিয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে, অস্বস্তিতে মন ভরে যায়। মেয়েটার রকম-সকম যখন ভালো লাগছে না, ওর কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকাই সে শ্রেয় বলে বিচার করে।

ক্ষেত্রপালকে তাই প্রথম থেকেই এড়িয়ে চলছে অরগ্যান-পা'। তবু মেয়েটা সুযোগ পেলেই ওর আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করছে। ভাব জমাবার চেষ্টা করছে।

কতক্ষণ একজন মানুষ আর একজনকে, বিশেষতঃ একজন মেয়েকে এড়িয়ে চলতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই অনেক সময় ক্ষেত্রপালের গায়ে পড়া কথায় অরগ্যান-পা'কে মুখ খুলতে হয়। কিন্তু 'হুঁ, হ্যাঁ কিংবা তাই নাকি ?'—এর বেশি কোন জবাব ফোটায় না সে। অনেক সময় দ্‌পল ইয়েকে মেয়েটার সামনে রেখে সরে পড়ে কোনকিছু একটা ছুতোয়।

তখন বেশ মজা হয়। দ্‌পল ইয়ে সংস্কৃত জানে না। মেয়েটার কোন কথা সে একবর্ণ বুঝতে পারে না। আবার মেয়েটাও তিব্বতী জানে না। তাই দ্‌পল ইয়ের কথাও সে এক অক্ষর বুঝতে পারে না। বাধ্য হয়েই কিছুক্ষণ পর উঠে প'ড়ে গুটি গুটি নিজের জায়গায় ফিরে যায় ক্ষেত্রপাল।

ভাগ্যিস ভারতীয়রা তিব্বতীদের মতো, বিশেষ ক'রে তিব্বতী

যোগীদের মতো অতো তাড়াতাড়ি চলতে পারে না। পারলে ক্ষেত্রপালকে পাশ কাটানো অরগ্যান পা'র পক্ষে বেশ মুশকিল হয়ে দাঁড়াতো।

সকাল বেলা যাত্রা শুরু করার সময় ভারতীয়রাও অবশ্য ওদের সাথে তাল রেখে এগোবার চেষ্টা করে। চলেও খানিকক্ষণ। তবে বড়োজোর আধঘণ্টা। তারপরই ওদের দম ফুরিয়ে যায়। বিশ্রাম নিতে বসে, কিংবা আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়ে। তাই রাতের বিশ্রাম নেবার জায়গায় ভারতীয়দের চেয়ে ওরা সব দিনই ঘণ্টা খানেক, কি ঘণ্টা দুই আগে পৌঁছে যায়। আরো অনেক আগে পৌঁছে যেতে পারতো। তবে জোরে হাঁটে বলেই বিশ্রামও নিতে হয় বার বার। তাই আর তা হয়ে ওঠে না। ভারতীয়রা এসে পৌঁছায় সেই বিকালে কিংবা গোধূলি বেলায়।

ফলে সারা দিনটা ক্ষেত্রপালকে স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে চলার সুযোগ পায় অরগ্যান্-পা'। মুশকিল যা ওই বিকালের পর ঘণ্টা কয়েক। রাত একটু ঘনিয়ে এলে ঘুমের ভাণ ক'রে এড়িয়ে যাওয়া চলে।

দিন দুই ধরে ক্ষেত্রপালের মধ্যে একটা জেদের ভাব দেখা দিয়েছে। যেন চলার দৌড়ে সে কিছুতেই ওদের কাছে হার মানতে রাজী নয়। এর ফলে অরগ্যান-পা' বেশ খানিকটা বিপদে পড়ে গেছে। পরশু তো অন্যান্য ভারতীয়রা পিছিয়ে পড়ার পর আরো ঘণ্টা দু'য়েক মেয়েটা তাদের সঙ্গে সমান তালে ছুটে চললো। আর যখন পারলো না, পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো, অরগ্যান-পা'কে ডাকাডাকি জুড়ে দিলো।

চক্ষু-লজ্জার খাতিরে দ্পল ইয়েকে নিয়ে অরগ্যান-পা' গতি মন্থর করলো। ভারতীয়রা অনেক পিছনে। একা একা মেয়েটা সত্যি যদি কোন বিপদে পড়ে।

অবশ্য ক্ষেত্রপাল সত্যিই বিপদে পড়তো একথা সে বিশ্বাস করে না। একজন ভারতীয় ডাকিনী বিপদে পড়বে এমন উদ্ভট কথা সে

তার কল্পনাতেও আনতে পারে না। কিন্তু মুশকিল হলো, ডাকিনী হোক আর যাই হোক, একটা মেয়ে যখন দৃশ্যতঃ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে ডাকছে, তখন পুরুষ হয়ে একেবারে চোখ কান বুজে থাকতে পারা যায় কি ?

পরে অরগ্যান-পা'র মনে হয়েছে এই পিছিয়ে পড়াটা ওর একটা ছল মাত্র। ডাকিনী বলেই মেয়েটা ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এতক্ষণ চলতে পেরেছে। সাধারণ মানবী হলে কখনোই পারতো না। আর, যে এতোটা পথ আসতে পেরেছে, সে তার ডাকিনী ক্ষমতা কি মন্ত্রের জোরে বাকী পথও ঠিক যেতে পারতো। তাছাড়া ডাকিনীর হাঁটবারই বা দরকার কি ? সে তো ইচ্ছে করলে পাখি হয়ে উড়েও যেতে পারে। পাখিই বা হবার দরকার কি ? এ দেশের ডাকিনীরা তো গাছ চালান বিদ্যাও জানে। গাছের উপর চড়ে বসে যেখানে খুশী সেখানে চলে যেতে পারে।

যে ডাকিনী উড়তে জানে, গাছ চালান দিতে জানে, সে কেন এতো কষ্ট ক'রে এভাবে হেঁটে হেঁটে চলেছে ? ওর মতলবটা কি ? আচ্ছা ! ও কি সত্যি সত্যি হেঁটে হেঁটে মান সরোবর গিয়েছিল ? বিশ্বাস করতে পারলো না অরগ্যান-পা'। তার দৃঢ় ধারণা জন্মে গেলো, ক্ষেত্রপালের ওই নাকের ক্ষত-টতো সব মিছে। ডাকিনীরা যেমন খুশী রূপ ধারণ করতে পারে। ক্ষেত্রপাল ইচ্ছে ক'রে ওই রকম রূপ ধারণ করেছে। সে মান সরোবর উড়েই এসেছিল। তাকে ফাঁদে ফেলে কোন একটা অভিসন্ধি পূরণের জন্যই সে এখন এ বেশে ওদের সাথে সাথে চলেছে। শুধু, সে নিজেও যোগী বলে মেয়েটা ওকে ফাঁদে ফেলতে পারছে না। খালি সুযোগ খুঁজে চলেছে। এতে নিজের উপরে, নিজের তান্ত্রিক ক্ষমতার উপরে অরগ্যান-পা'র বেশ খানিকটা আস্থা ফিরে এলো।

তার ধারণা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি গতকাল তা প্রমাণ হয়ে গেছে। আগের দিন রাতেই সে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল,

মেয়েটাকে সে আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলার সুযোগ দেবে না। সকলের আগে বেরিয়ে পড়বে সে তার দলবল নিয়ে। পরিকল্পনা মতোই কাজ হলো। কিন্তু অবাক কাণ্ড। রাতের ডেরায় পৌঁছে ওরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছে, দেখে, ওদের তিব্বতী দলটির পিছু পিছু ক্ষেত্রপালও হাজির। ওর দিকে তাকিয়ে সে যেন বিজয়িনীর হাসি হাসলো। অরগ্যান-পা'র আর সন্দেহ রইলো না—মেয়েটা আজ উড়েই এসেছে।

আজও সবার আগে আগে চলেছে ওরা পাঁচজন। অরগ্যান-পা' আর তার চার সঙ্গী। আর ঘণ্টাখানেক চললেই রাতের ডেরায় পৌঁছে যাবে। গতি তাই আপনা থেকেই একটুখানি ঢিলে হয়ে এলো। হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে অরগ্যান-পা'র গায়ে হাত ছোঁয়ালো। চমকে পিছন ফিরে অরগ্যান দেখে, আর কেউ নয়, ক্ষেত্রপাল। চোখাচোখি হতেই ক্ষেত্রপাল একটু হাসলো। শরীরটা কেমন যেন ছমছম ক'রে উঠলো তার। চুপচাপ চোখ দুটো সরিয়ে নিয়ে নীরবে হাঁটতে থাকলো সে।

ক্ষেত্রপাল নাক ঝেড়ে খানিকটা রক্ত আর পুঁজ ঝরালো মাটিতে। তারপর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে একটুখানি হেসে বললো···গুরুর কাছে নিজেকে কখনো অপদার্থ প্রমাণ করতে নেই, সঙ্গীদের কাছে কখনো ছোট হতে নেই।

ও যে কি বলতে চাইছে বুঝতে কষ্ট হলো না অরগ্যান-পা'র। মুখে সংক্ষিপ্ত জবাব ফোটালো : তাই নাকি? তারপর উদাসীন ভঙ্গীতে সুদূরে দৃষ্টি ফেলে পা চালাতে থাকলো।

ক্ষেত্রপালও হয়তো ওর ওই অনীহ মনোভাব দেখেই, কিছু না বলে পাশাপাশি নীরবে হেঁটে চললো। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার বললো : 'জানো! এই শহরেই আমি থাকি।'

ওঃ।

হ্যাঁ। বেশ ভালো শহর।

'ওঃ'—চোখ অন্য দিকে রেখেই কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত ধ্বনি তোলে অরগ্যান-পা'।

এখন এদেশে গ্রীষ্মকাল। নিচের দিকে প্রচণ্ড গরম। তোমরা ঠাণ্ডা দেশের মানুষ। এ জল বাতাস সহ্য হবে না তোমাদের।

কোন জবাব দেয় না অরগ্যান-পা'।

তারপরেই আবার বর্ষা বিরতি। তখন তো কোথাও যেতেই পারবে না। এ মাস কটা এখানেই কাটিয়ে যাও না।

এখানে ?···ওর কথায় সে যেন একটু চমকে ওঠে।

হ্যাঁ···চমকে উঠলে যে ?···থাকা খাওয়ার ভাবনা ? সেজন্য কিছু চিন্তা ক'রো না। থাকার ব্যবস্থা আমিই ক'রে দেব···খাওয়া দাওয়ার ভারও আমিই নিলুম।

অ্যাঁ···চমকের বিষম ধাক্কায় অরগ্যান-পা'র দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন কেঁপে উঠলো। পা দুটো আপনা থেকে স্তব্ধ হয়ে গেলো। তার তৃতীয় নয়নে ভেসে উঠলো দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় ছটফট ক'রে চলা একটা ভেড়ার চেহারা। এই ভেড়াটা আর কেউ নয়··· সে নিজেই। গায়ে খানিকটা মন্ত্রপূতঃ জল ছিটিয়ে দিয়ে ডাকিনীটা বেমালুম তাকে কচি···নধর একটি···। তারপর ?···অরগ্যান-পা' অনুভব করলো একটা শীতল স্রোত তার মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে শির শির ক'রে উপরের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে মনে মনে তন্ত্রগুরু পদ্মসম্ভবের নাম স্মরণ ক'রে সে আবার চুপচাপ চলতে শুরু করে।

ওকে ওভাবে চুপচাপ চলতে দেখে ক্ষেত্রপাল বলে···কী চুপ করে যে···হ্যাঁ—না কিছুই বললে না তো ?

ভেবে দেখি।···জবাব দিতে গিয়ে অরগ্যানের গলা কেঁপে ওঠে। মনে মনে বলে···যতোই মিষ্টি কথা বলো না কেন, তোমায় আমি চিনে গেছি···কিছুতেই ওসবে ভুলছি নে। অরগ্যান (উদ্যান) যাবো বলে বেরিয়েছি···সেখানে যাবোই। তাই, তোমার ফাঁদে আমি

কিছুতেই পা দিচ্ছি নে। কাল ভোরের আলো ফোটার পর আর তুমি দেখা পাচ্ছো না আমার।

মরু বা ছাম্ব শহরে দুরু দুরু বুকে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সূর্য ওঠার আগেই 'গর্ণতম মহা পর্বতের' দিকে যাত্রা করলো অরগ্যান-পা'। 'উত্তর পাঞ্জাবের বা আধুনিক হিমাচলের এই পাহাড়ী অঞ্চলটিতে অনেক দামী দামী দুর্লভ ওষধি গাছ-গাছড়া জন্মায়। রয়েছে পাঁচটি অলৌকিক ঝরনা।'

জায়গাটি ওদের বেশ পছন্দ হলো। থাকার আশ্রয়ও জুটে গেলো একটি বৌদ্ধ বিহারে।

অরগ্যানের মনের, তার ধ্যান ধারণার যে পরিচয় এতক্ষণ পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হবে সে বুঝি একজন সাধারণ স্তরের অশিক্ষিত বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি কিন্তু মোটেই তা নন। তার সময়কালীন তিব্বতের তিনি একজন সেরা বৌদ্ধ পণ্ডিত। ধর্ম ব্যাখ্যা, বিতর্ক-আলোচনা ও রচনা এ তিন বিদ্যায় সে সময় তিব্বতে কেউ তার জুড়ি ছিল না। তন্ত্র-বিদ্যায় তার গুরু ছিলেন র্গদ তসঙ পা' (rgod ts'an pa)। তিনিও তার কালের এক বিখ্যাত সিদ্ধ-পুরুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সে খ্যাতি আজও অম্লান।

তিব্বতে জুর ৎসো অঞ্চলে 'গো লুন'-এ অরগ্যান-পা'র জন্ম হয়েছে। বাবার নাম জো পন। তিনি র-গ্যস গোষ্ঠীর লোক ছিলেন।

সাত বছর বয়সে অরগ্যান-পা' র্গদ তসঙ পা'র শিষ্য হলেন। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তার কাছে থেকে যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করেন। এর মধ্যে 'কিল', 'হেবজ্র' ও 'বজ্রপাণি' তান্ত্রিক পদ্ধতিও রয়েছে। বড়ো ভাই ম্দো স্দে দ্পল-এর কাছে 'প্রজ্ঞা'র উপর লেখা একখানি ছোট টীকাবইও তিনি পড়েন। এই সঙ্গে শুরু হয় বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা। অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়ে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যেই বিভিন্ন গুরুর

কাছে বিভিন্ন বিশেষণ লাভ করেন। বো-দণ্ড-এর রিন রংসের কাছ থেকে পান 'মকন-পো' খেতাব। জগু এর ব্‌সম গিলিঙ পা'-র কাছ থেকে পেলেন স্লোব দ্‌পোন উপাধি। আচার্য ব্‌সোদ ওদ পা'-র কাছ থেকে পেলেন গ্‌সন স্তোন' বিশেষণ। এরপর তিনি রিন চেন দ্‌পল উপাধিও পান।

বিদ্যার একটি শাখাকে পুরোপুরি আয়ত্ত করার শপথ নিয়ে এক-টানা বারো বছর তিনি তা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়াশুনা ক'রে চলেন। প্রতিজ্ঞা ক'রে এই সময় তিনি মাংসও বর্জন করেন।

এরপর বো দণ্ড-এর রিন রংসে বিদ্যাপীঠে হ্‌গরো পদ্ধতির কাল-চক্র নিয়ে পড়াশুনা ক'রে তাতে পারদর্শী হন।

'কালচক্র' চর্চার ক্ষেত্রে তিনি মূল প্রেরণা পান র্‌গদ ৎসিন পা'-র কাছ থেকে। এ নিয়ে ব্যাপক চর্চা করতে গিয়ে এক সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে তার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে 'সম্ভল' ধারার কোন সঙ্গতি নেই। সঙ্গতি রয়েছে অরগ্যান বা উদ্যান-ধারার সঙ্গে। তখন তার মধ্যে সংকল্প দেখা দিলো অরগ্যান বা উদ্যান আসার।

ভ্রমণ পরিকল্পনা ঠিক হয়ে যেতে প্রথমে তিনি এলেন তিব্বতের উত্তর-মরুভূমি অঞ্চলে। সেখানে ন'মাস কাটালেন। জীবনীতে বলা হয়েছে সেখান থেকে তিনি চারজন সঙ্গী নিয়ে রওনা হয়ে তি-সে বা কৈলাস পর্বত আসেন ও সেই পথ দিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সঙ্গীদের মধ্যে দ্‌পল ইয়ে ছাড়া আর কারো নাম জানা যায় না।

অরগ্যান-পা' অতি বিদ্বান ও প্রতিভাবান হলেও, মনে রাখতে হবে, তিনি ছিলেন মধ্যযুগীয় ধর্মীয় জগতের মানুষ। দৈব বা অলৌকিক ঘটনা ও কাণ্ড-কারখানায় তারা পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করতেন। আবার সে ধারণা সব মানুষের মধ্যে যাতে প্রবাহিত থাকে সেজন্যও তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। অরগ্যান-পা' ছিলেন আবার যোগ ও তন্ত্র-শাস্ত্রের অনুগামী। এ দুই সাধনার লক্ষ্য শুধু মোক্ষই নয়, ওই সাথে

অলৌকিক বা অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। সুতরাং তার ধ্যান-ধারণা যে অলৌকিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবে এতে আর আশ্চর্য কি! বিশেষ করে তিনি যখন এ যুগের নন, ত্রয়োদশ শতকের মানুষ।

এখানে তিব্বতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পশ্চাৎ পটটি জানলে পাঠকের পক্ষে অরগ্যান পা'র মনটি জানা হয়তো আরো কিছুটা সহজ হবে।

বোধহয় কুষাণরাজ কণিষ্কের আমল থেকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের উদ্যম শুরু হয়। তবে তখনকার সে প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয়েছিল বলে মনে হয় না। তিব্বতীদের মধ্যে তাদের আদি ধর্ম 'বন' এর প্রভাব অপ্রতিহত ধারায় চলতে থাকে। তুকতাক, মন্ত্র, ভূতপ্রেত, অপদেবতায় বিশ্বাস এ ধর্মের একটি সাধারণ অঙ্গ ছিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজনৈতিক দিক থেকে তিব্বত বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ওই সময়ে তিব্বতের অধিপতি রানম-রি-শ্রোণ-বস্তান উত্তর-পূর্ব ভারতে তার অধিকার বিস্তার করেন। নেপাল তার করদ রাজ্যে পরিণত হয়। কামরূপে বর্মন বংশীয় শেষ অধিপতি ভাস্কর বর্মণের পর এ রাজ্যটিও বোধ হয় কিছুকালের জন্য তিব্বতের অধিকারে চলে যায়। তাদের দ্বারা এ সময়ে বাঙলা অভি-যানের কথাও শোনা যায়। তবে এর ফলাফল অজানা। ভারতীয়রা এ সময়ে তিব্বতকে ভোট দেশ ও তিব্বতীদের 'ভোট' বলে উল্লেখ করতেন। বহুকাল ধরে সেই নামেই তারা এদেশে পরিচিত ছিলেন।

তিব্বত অধিপতি শ্রোণ বস্তান চীনা রাজকুমারী ও নেপাল রাজ-কুমারীকে বিবাহ করেন। দুই রাজকুমারীই ছিলেন বৌদ্ধধর্মানুগামী। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজা নিজেও এই ধর্মে দীক্ষিত হলেন। রাজ-পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আবার নতুন ধারায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ শুরু হয়। মধ্য ও পূর্ব ভারত থেকে নেপাল হয়ে এই ধারা

প্রবাহিত হতে থাকে। এ অঞ্চলের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যেমন ধর্ম প্রচারের জন্য এ সময়ে তিব্বত যান, তেমনি সেখানকার ভিক্ষুরাও তীর্থ করতে, ধর্ম ও দর্শন চর্চা করতে এদেশে আসতে থাকেন। উভয় দেশের মধ্যে নিয়মিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শুরু হয়। তারা এ সময়ে এসে বিখ্যাত নালন্দা ও বিক্রমশীলা মহাবিহারে থেকে সংস্কৃত ভাষা, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, যোগ ও তন্ত্র শাস্ত্রের চর্চা করে যেতেন। বিভিন্ন শাস্ত্র পুঁথি নকল করে নিয়ে যেতেন। নালন্দা মহাবিহার ছিল সেকালের মধ্যভারত মগধ রাজ্যে। আর বিক্রমশীলা মহাবিহার পূর্ব ভারতে বাঙলায়।

ভারতীয় বৌদ্ধধর্মে এ সময়ে বিশেষভাবে হঠযোগ ও তন্ত্রসাধনার জোয়ার বইতে শুরু করেছে। নানা দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাই, তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মেও স্বভাবতই তার প্রভাব পড়লো।

এ সময়কার যোগাযোগ তিব্বতের সাংস্কৃতিক জীবন ক্ষেত্রে আরো একটি দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতকাল তিব্বতের কোন অক্ষরমালা ছিল না। ছিল না তার ভাষার কোন লিখিত রূপ। ভারতীয় অক্ষবমালার অনুসরণ করে প্রথম তার অক্ষরমালা তৈরী হলো, ভাষার লিখিত রূপ দেওয়া হলো।

অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত মধ্য ও পূর্ব ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি বহু তিব্বতী ভিক্ষু তীর্থ করতে বা শাস্ত্র চর্চা করতে এসে শেষ পর্যন্ত এখানেই জীবন কাটিয়ে যেতেন। সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে এসে চীনা পরিব্রাজক ইৎসিঙ এ রকম দুজন তিব্বতী বৌদ্ধ ভিক্ষুর দেখা পান। এরা ছিলেন তিব্বতের যুবরাজের ধাত্রীর সন্তান। এদের এক ভাই পরে গৃহী জীবনে ফিরে যান। দুজনেই নেপালে থাকতেন। ‘স্বর্গীয় রাজাদের বিহার’-এ বাস করতেন। এরা সংস্কৃতে কথা বলতে পারদর্শী ছিলেন, সক্ষম ছিলেন সংস্কৃত পুঁথি পড়ে তার অর্থ গ্রহণে।

পূর্ব ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ স্তব্ধ ও যোগাযোগ বন্ধ হয়ে

যাবার পর উত্তর ভারত থেকে এ প্রবাহ বইতে শুরু করে। পূর্ব-ভারত ছিল সম্ভল বা সংবর তন্ত্রধারার প্রধান পীঠ। এতোকাল এখান থেকে প্রধান ভাবে এই ধারাটিই তিব্বতে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম ভারত ছিল তন্ত্রের উদ্যান বা উড্ডীয়ান ধারার প্রধান পীঠ। উদ্যান বা উড্ডীয়ান দেশ থেকেই এর এই নাম। নবম শতাব্দীতে বিশিষ্ট বৌদ্ধ তন্ত্রাচার্য সিদ্ধ পদ্মসম্ভব জন্মগ্রহণ করেন এখানে। তিনি তিব্বত গিয়ে, সেখানকার আদিধর্ম 'বন' এর মুখ্য প্রবক্তাদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। তন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন তিব্বতীদের নিকট। পদ্মসম্ভব সেখানে প্রথম বৌদ্ধ সংঘের-ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার খ্যাতি ও প্রভাব থেকে তিব্বতীদের মধ্যে তন্ত্রের সম্ভল ধারার তুলনায় উড্ডীয়ান ধারা অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। উড্ডীয়ান বা উদ্যান দেশ একটি পবিত্র পুণ্যতীর্থরূপে, তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পীঠরূপে বিবেচিত হতে থাকে। পদ্মসম্ভবের পর তিব্বতগামী ভারতীয় ভিক্ষুদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করবার মতো হলেন শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর। ইনি পূর্ব ভারতীয় হলেও পশ্চিম-উত্তরের পথে সে দেশে যান। এ সময়কার যোগাযোগ পথটি ছিল পার্বত্য পাঞ্জাব বা আধুনিক হিমাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে। তিব্বতে সংঘের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা যদিও পদ্মসম্ভব, তাহলেও তিনি মাত্র একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিলেন। অতীশের প্রচেষ্টায় তা তিব্বতে ছড়িয়ে পড়ে, অনেক বিহার গড়ে ওঠে। তিনি ১০৪২ অব্দে সেখানে যান।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের পথ দিয়ে যে যোগাযোগ সুরু হয় তা প্রধানতঃ এক তরফা ছিল। অর্থাৎ, প্রধানভাবে ভারতীয় বৌদ্ধরাই সেখানে যেতেন। ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে যায়। বৌদ্ধধর্ম তখন ভারত থেকে ক্রমশ লোপ পাবার পথে।

আদি ও অকৃত্রিম রূপটি নিয়ে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে যেতে পারেনি

একথা আগেই বলা হয়েছে। আবার ভারতে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিলুপ্তি ও উভয় দেশের মধ্যে যোগাযোগের অভাব তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মকে তার নিজস্ব ধারায় পরিবর্তিত হয়ে চলতে বাধ্য করে। আদি ধর্ম 'বন'-কে আত্মস্থ করে সে সেখানে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে তিব্বতের নিজস্ব ধর্মের রূপ নেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়েও বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে হঠযোগ ও তন্ত্রের প্রভাব অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত থাকে।•

দীর্ঘকাল পারস্পরিক যোগাযোগ না থাকার দরুন ত্রয়োদশ শতাব্দীর তিব্বতীদের কাছে ভারত এক অচিন রূপকথার দেশ, অলৌকিক কাণ্ডকারখানার দেশ হয়ে উঠেছিল। কিছুটা অলৌকিকত্ব যে এদেশের ভিক্ষুরাও সেখানে রপ্তানি করেছিলেন তা মনে করার মতো যথেষ্ট কারণও রয়েছে। বহুকাল পর অরগ্যান-পা'র গুরু সিদ্ধ র্‌গদ তসঙ পা' যোগাযোগের স্তব্ধতা ভেঙে হিমাচলের পথ দিয়ে ভারত আসেন। তবে, তিনি শুধু পূর্ব-পাঞ্জাবের জালন্ধর অবধি এসে সেখান থেকে ফিরে যান। তার ভ্রমণ কাহিনী এর পরেই আমরা শোনাবো।

গুরুর সেই ভ্রমণই বোধহয় অরগ্যান পা'কে প্রেরণা জুগিয়েছিল এ দেশে আসার জন্য। তার মনে সংকল্প এনে দিয়েছিল জালন্ধর পেরিয়ে ভারতের আরো ভিতরের দেশগুলিতে যাবার—দূর তীর্থ করার। উদ্দীপিত করেছিল পদ্মসম্ভব, তার গুরু ইন্দ্রভূতি ও সিদ্ধ লাভাপা'র দেশ উড্ডীয়ান বা উদ্যান যাবার জন্য।

সুতরাং অরগ্যান পা' জানাশোনা কোন মাটির মানুষের দেশে আসেননি। এসেছেন এক অচিন রূপকাহিনীর দেশে, অলৌকিক দেশে। কল্পনায় রঙীন এক স্বপ্ন পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে তিনি এদেশের মাটিতে তার প্রতিটি চরণচিহ্ন এঁকে চলেছেন।

উড্ডীয়ান বা উদ্যান আধুনিক কাবুল বা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে সুবাস্তু বা স্বাত নদীর উপত্যকা অঞ্চল। মূল উদ্যান শহরটি বোধ হয় বর্তমানের উদিগ্রাম। সপ্তম শতাব্দীতেও এ রাজ্যটি

তন্ত্রের এক প্রধান পীঠস্থান ছিল বলে জানা যায়। ওই সময়কার বিশিষ্ট চীনা তীর্থযাত্রী ও বৌদ্ধ পণ্ডিত হিউয়েন-সাঙ তার বিবরণ মধ্যে বলেছেন :

"উদ্যান রাজ্যটি আয়তনে ৫০০০ লি মতো। একের পর এক উপত্যকা আর জলাভূমি উঁচু মালভূমির সঙ্গে মিতালী ক'রে এগিয়ে চলেছে। অনেক রকম শস্য বোনা হয় এখানে। তবে ফসল তেমন ভালো হয় না। আঙুরের ফলন প্রচুর, আখ অল্পসল্প। মাটির নিচ থেকে সোনা ও লোহা মেলে। ও-কিন বা হলুদ (ফুল কন ?) নামে একজাতীয় গন্ধসার গাছ চাষের পক্ষে জায়গাটি খুব উপযোগী। বনাঞ্চল বেশ ঘন, আলো ঢুকতেই পায় না। ফুল ও ফল-ফলাদি অজস্র। ঠাণ্ডা আর গরম দুই-ই মানানসই। বৃষ্টির প্রকোপ তাদের ঋতু অনুসারে।

"এখানকার লোকেরা কোমল ও স্নেহপরায়ণ। তবে চাল-চলনের দিক থেকে কিছুটা ধূর্ত ও কপট। জ্ঞানের কদর করলেও তা অর্জনের দিকে কোন মনযোগ নেই। ভোজবাজী, তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা ও অভ্যাসের দিকে বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। তাদের পোষাক হলো সাদা স্থূতীর কাপড়, এছাড়া আর বিশেষ কিছু পরে না।

"ভারতের ভাষা থেকে এদের ভাষা কোন কোন দিক থেকে পৃথক হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে মিল রয়েছে। লেখার বর্ণমালা ও সামাজিক রীতিনীতিও ওই রকম মিশেল ধরনের কিছুটা। এরা বুদ্ধের প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণ ও মহাযান পন্থী।"

হিউয়েন সাঙ, তার পূর্ববর্তী চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অরগ্যান পা'র সামান্য পরবর্তী মারকো পোলোর বিবরণ থেকে সংকেত পাওয়া যায় যে উড্ডীয়ান বা উদ্যান বলতে শুধু উদ্যান শহর ও তৎসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলকে বোঝাতো না। কাবুল নদীর উত্তর ও সিন্ধু নদের পশ্চিমে থাকা এক বিস্তৃত অঞ্চলকে বোঝাতো। তার মানে আধুনিক পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

প্রদেশের উত্তরাংশ এবং আফগানিস্তান বা কাবুলের উত্তরাঞ্চলের কতক অঞ্চল। মারকো পোলো একে 'পশই' নামে উল্লেখ করেছেন। তার দেয়া বর্ণনা এই রকম :

"বাদাকশান (বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত শহর) থেকে দক্ষিণ দিকে দশদিন চললে পশই রাজ্যের দেখা মিলবে।

"এখানকার বাসিন্দারা একটি অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে। তারা সবাই প্রতিমা-পূজক। তাদের গায়ের রঙ বাদামী। মায়াবিদ্যা ও তন্ত্রমন্ত্রের দিকে তাদের দারুণ ঝোঁক। এখানকার পুরুষেরা কানে দুল পরে। সোনা ও রূপার ব্রোচ আঁটে। মুক্তা ও রত্ন পাথর খচিত অঙ্গদ পরে। তারা অতি কপট ও পরের ক্ষতি সাধনে পটু।"

মারকোর সময়ে দির শহর পশই বা উড্ডানের রাজধানী ছিল। এ শহরটি বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উত্তরাংশে।

আবার আমরা মূল কাহিনীতে ফিরে যাই।

মনে আছে নিশ্চয়, অরগ্যান-পা' কুলু ও মরু (ছাম্ব) শহর পার হয়ে গর্ণতম মহা-পর্বতে এসেছেন। চার সঙ্গীকে নিয়ে গরমকালটা এখানেই কাটাচ্ছেন। এই পর্বতটির সঠিক ভারতীয় নাম কী তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। মনে হয়, মরু বা ছাম্ব রাজ্যের কোন একটি অঞ্চলেই এটি অবস্থিত।

এখানে থাকাকালে 'গৃধ্র' (vulture) নামে এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর সাথে তার আলাপ পরিচয় হলো। ধর্ম-ব্যাখ্যানে দক্ষ বলে এই সন্ন্যাসীর বেশ নাম ডাক রয়েছে। অরগ্যান পা'ও বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন যানের মতবাদগুলিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন সবার কাছে। শুনে সেখানকার সাধুরা বেশ খুশী হলেন। করলেন, অরগ্যানের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা।

গরমকাল পার হতে অনেক ভারতীয় সাধু সে পাহাড়ী এলাকাটি ছেড়ে নিচে জালন্ধর রাজ্যের দিকে রওনা হলেন। অরগ্যানও তার

চার সঙ্গী নিয়ে তাদের মেলে ভিড়ে গেলেন। চললেন জালন্ধর।

এ রাস্তাও সহজ সরল নয়। উঁচু নিচু পাহাড়ী এলাকা। অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে এগিয়ে চলতে হচ্ছে। উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে সংকীর্ণ দুর্গম গিরিপথ আর গিরিখাত পার হতে হলো তাদের।

এভাবে টানা একমাস দক্ষিণ দিকে পথ চলার পর তারা জালন্ধরে রাজনগরীতে এসে পৌছালেন। শহরটি মোটামুটি বড়ো। নাম নগরকোট। এখানে একটি বিরাট বাজার আছে। দরকারী সব রকম জিনিষপত্তর সেখানে মেলে। অরগ্যান-পা'র কাছে পয়সাকড়ি বিশেষ কিছু নেই; তাই ইচ্ছে থাকলেও তার পক্ষে তেমন কিছু কেনাকাটা সম্ভব হলো না।

'এই নগরকোটে নদীর বুকে একখণ্ড ত্রিকোণ ভূমি রয়েছে। এর মাটি খোঁড়াখুঁড়ি নিষেধ। লঙগুরা নামে এখানে একটি শ্মশান আছে। সেখানে জলস্রোতে ক্ষয়ে যাওয়া একটি পাথর দেখা যাবে। এটি দেখতে ঠিক মড়ার খুলির মতো। শ্মশান ক্ষেত্রে আর্য ভট্টারিকার একটি মূর্তি আছে। উত্তর দিকে গেলে জ্বালামুখী নামে আরেকটি প্রসিদ্ধ মূর্তি। তার অলৌকিক মুখের দিকে তাকালে চোখ যেন ঝলসে যায়।'

রাজপ্রাসাদের কাছে আরেকটি শ্মশান রয়েছে। এর নাম মিতগ্লুপ (মৃত গুম্ফা ?)। শ্মশান লক্ষণের বৈশিষ্ট্য রূপে যে আট রকম গাছের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে তার একটি গাছ এই শ্মশানটিতে অরগ্যান দেখলেন। গাছটির নাম 'নীল বৃক্ষ'। 'এ গাছের গায়ে কোনরকম আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে।'

এই জালন্ধরে অরগ্যান-পা' তার তিনজন সঙ্গীকে দল থেকে বাদ দিলেন। তার বিচারে তারা দূর তীর্থযাত্রার অযোগ্য। পথকষ্ট সইবার মতো, যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার মতো যথেষ্ট সাহস ও ধৈর্য্য তাদের নেই। শুধু দ্‌পলকে নিয়েই এবার তিনি এগিয়ে চললেন।

কুড়িদিন ধরে উত্তর ঘেঁষা পশ্চিমদিকে এগিয়ে চললেন। পৌঁছালেন ইন্দ্রনীল শহরে। শহরটি একটি নদীর পাড়ে। ঘটলি (বা গন্ধোল) থেকে নদীটি একদিক পানে বয়ে চলেছে। নাম পেয়েছে চন্দ্রভাগা।

নদীর এ পার বা পূব অঞ্চল রগ্য স্ক্যগস (rgya sKyags)-এর সমতল ভূমি। অর্থাৎ, পাঞ্জাব বা ভারতের সমতল ক্ষেত্র।

একদিন রাতে অরগ্যান-পা' এ শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ একটি দৃশ্য তার নজরে এলো। একজন স্ত্রীলোক গান গাইতে গাইতে একটি থলির মধ্যে নানা অস্ত্র মাটি থেকে তুলে তুলে রাখছে।

বুকটা ধ্বক ক'রে উঠলো তার। এ স্ত্রীলোকটি যে একজন ডাকিনী এতে অরগ্যান-পা'র একটুও সন্দেহ রইলো না। পৃথিবীতে এতো জিনিষ থাকতে ও এ সময়ে থলির মধ্যে অস্ত্র পুরছিল কেন? গানই বা গাইছিল কেন? ও কি কিছু বলতে চেয়েছে অরগ্যান-পা'কে এভাবে? কী বলতে চেয়েছে? আসন্ন কোন বিপদের কথা? অস্ত্রগুলি কি তারই সংকেত। এ গান কি ওই বিপদ সংকেতের দিকে অরগ্যানের মনোযোগ আর্কষণ করার জন্য।

আসল ব্যাপার যে তাই, এ কথা অরগ্যান পুরোপুরি বুঝতে পারলো বিপদটি ঘটে যাবার পর। দৈব সংকেতের বৈশিষ্ট্যই এই। কোন কালে খোলাখুলি পরিষ্কার কিছু বলবে না। আভাসে ইঙ্গিতে সূচনাটি দিয়ে তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলবে। যদি তোমার প্রজ্ঞা থাকে তা দিয়ে বুঝে নাও, নিজেকে রক্ষা করো। বিপদ যদি শেষ পর্যন্ত না আসে, ভেবো না সংকেত মিথ্যা। বুঝবে, তুমি তোমার প্রজ্ঞা বা দৈবানুকুল্য বলে এক ভয়ংকর বিপদ পার হয়ে গেছ। আর, বিপদ যদি ঘটে তাহলে বুঝতে হবে, প্রজ্ঞার একান্তই অভাব তোমার। তাই, দৈব সহায়তা পেয়েও তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারলে না।

যাই হোক, এ নেহাৎই আমার কথা, অরগ্যান-পা'র কথা নয়। অরগ্যান-পা'র কী হলো, কী বিপদ ঘটলো তাই এবার বলি।

পরদিন ভোরবেলা সে চারজন তাতারের রোষদৃষ্টিতে পড়ে গেল। তাতাররা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। তারা ও অন্যান্য যাত্রীরা বেশির ভাগই হেঁটে হেঁটে। তাতার আর তিব্বতীরা অনেকটা একই রকম দেখতে। উভয়েই মোঙ্গলীয়। একেশ্বরবাদী মুসলমান তাতাররা তাই বোধ হয় তাদের চেহারার দুই মূর্তিপূজক উজবুককে দেখে ক্ষেপে গেলো। তবে, কারণটি ঠিক কী তা অরগ্যান-পা' খুলে বলেন নি। শুধু বলেছেন ওই চারজনের মধ্যে একজন তাতার কুঠারের পিছন দিয়ে তাকে বেমক্কা পিটুনী লাগালো। সেও ক্ষেপে গিয়ে প্রচণ্ড ভাবে তাকে বাধা দিলো। কিন্তু তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পাবলো না। যোগাভ্যাসেব সময় দুরূহ ভঙ্গীর আসনের বেলা যে কাপড়টি দিয়ে তিনি তার পা বেঁধে নিতেন, সেটি দিয়ে তাতারটি তাকে বেঁধে (বা তার গলায় জড়িয়ে) হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো। বুকে পাঁজরে লাথি কষাতে থাকলো। পুরো একটি বেলা এ রকম চললো। যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখলো অরগ্যান-পা'। শেষে যোগ-প্রক্রিয়ার শরণ নিলো। প্রাণবায়ু ও মানসিক শক্তিকে বিন্দু-চক্রে কেন্দ্রীভূত ক'রে তাকে মূল শিরাতে প্রবাহিত ক'রে চললো।

অরগ্যান-পা'র দৃশ্যতঃ অচেতন অবস্থা দেখে দ্পল ইয়ে ধরে নিলো, সে মারা গেছে।

ওই ভাবে বল সঞ্চয় ক'রে, হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে, অরগ্যান-পা' বিরাট হুঙ্কার জাগালো। তান্ত্রিকের বশীকরণ দৃষ্টি মেলে তাতার-টিকে সম্মোহিত ক'রে ফেললো। ফলে তাতারের কথা কইবার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেছে তখন, থর থর ক'রে সে কেঁপে চলেছে। সবাই বুঝলো সত্যিই অরগ্যান-পা' একজন সিদ্ধ পুরুষ। পরিস্থিতি এবার পালটে গেলো।

ইন্দ্রনীল থেকে একটি দিনেই তারা ভ্রমিল বা বরমিল এসে গেলেন। সেখান থেকে তারপর সিল বা হিল। এ জায়গাটি বোধ হয় এখনকার হেতান। এরপর যে শহরটিতে এসে পৌঁছালেন, সেটি

তখন মোঙ্গলদের অধিকারে। শহরটির নাম পরে ভুলে যাওয়ায় অবগ্যান-পা' তার পরিচয় আমাদের জানিয়ে যেতে পারেননি। তুচ্চির (Tucci) ধারণা শহরটি মোঙ্গ বা হরিয়া।

"এ অঞ্চলের পর থেকে যতোই উপর দিকে (উত্তর-পশ্চিমে) এগিয়ে যাবে ভারতীয়দের সঙ্গে তাতারদেরও চোখে পড়বে। (ভারতের লোকদেব) কতক হিন্দু, কতক মুসলমান (তাতার)। কতক আবাব এদের মিশ্রণ। আর সমতলে যারা বাস কবছে তাদের মোগল বলা হয়।"

পথ চলে চলে এবার তারা একটি নদীর কূলে এসে পড়লেন। নদীটি কাশ্মীর থেকে এদিকে নেমে এসেছে।

তাব মানে তীর্থযাত্রী দু'জন পৌঁছেছেন এসে ঝিলম নদীর তীরে।

তারা নদী পার হলেন। এলেন ব্রহোর নামের একটি শহরে। এখানে ৭০ লক্ষ (হাজার ?) লোকের বাস। শাসনকর্তা একজন তাতার। নাম, মালিক করদরিন।

শহরটি পেছনে রেখে একদিন পথ চলার পর তারা একটি খনিজ লবণ পাহাড়ের কাছে হাজির হলেন। এটির নাম নলকুগরি (লবণ গিরি বা নউগিরি)।

"এখান থেকে কাশ্মীর, মালোও (মলোট বা মালকোট), ঘোদসার (গুজরাট), ধোকুর (দক্ষিণ বা দক্ষিণাপথ) ও জালন্ধরে নুন যায়। অনেক লবণ ব্যবসায়ী এখান থেকে যাওয়া আসা করে। এই লবণ খনিগুলির দিকে যে বড়ো রাস্তাটি গেছে সেটিতে বিপদ আপদের সম্ভাবনা খুব অল্প। কেননা, পথে প্রচুর খাবার, অনেক সঙ্গী মেলে। বাজারও আছে অনেক।"

ঝিলম নদী পার হয়ে প্রথম যে বড়ো শহরটিতে দু'জনে এলেন সেই ব্রহোর বা ভহোল খুব সম্ভব পিণ্ডি দাদন খাঁ শহরের সঙ্গে অভিন্ন। এটি এককালে বড়ো লবণ বাজারগুলির একটি ছিল। অধিবাসীদের সংখ্যা যা দিয়েছেন তা অবশ্যই ফাঁপানো।

লবণ পাহাড় থেকে তিনদিন (বা একদিন) পশ্চিম দিকে চলার পর তারা মালকূট বা মলোট এলেন। সেখানকার রানীর কাছে গিয়ে অন্ন ভিক্ষা করলেন। রানীর নাম ভুজদেবী। তিনি তাদের খাদ্য, অন্যান্য জিনিষপত্র ও পোষাক দিলেন।

অরগ্যান-পা'র বর্ণনা মতো এ জায়গাটি সাগর-দ্বার ও রত্নখনি হিসাবে প্রসিদ্ধ। হুলাহু রাজার তৈরী একটি মন্দির আছে এখানে। এছাড়া কণ্টকারি নামের ভেষজ গাছটিও এ রাজ্যে প্রচুর জন্মে।

এবার দু'জনে উত্তর-পশ্চিমদিকে পথ চলতে শুরু করলেন। পাঁচ দিন পর এসে গেলেন রুকল শহরে। এখানকাব রানীব নাম সোমা-দেবী। সাহায্যের জন্য তার কাছে গেলেন। তীর্থ ভ্রমণের জন্য যা কিছু দু'জনেব প্রয়োজন সব তিনি দিলেন।

খুশী মনে এগিয়ে চললেন দু'জনে। চারদিন পথ ভাঙাব পর এলেন এবার রজহুরা। এটি অরগ্যান বা উদ্যান যাবার চারটি পথের একটি। অন্য তিনটি পথ হলো নীল, পুরসো ও কচোক।

রজহুরায় এসে দু'জনে ভিক্ষা করতে বেরোলেন। যা ফল-মূল এভাবে পেলেন, খেতে গিয়ে দেখেন সেগুলিকে সব পিঁপড়ে ও পোকায় ছেঁকে ধরেছে। সে দৃশ্য দেখে দ্পল ইয়ের পেট ঘুলিয়ে উঠলো। সে তার কোন কিছুই মুখে ছোঁয়ালো না। অরগ্যান তা দেখে চোখ কুঁচকে তাকে বললেন, কি হলো ? খাও! তবু সে না খেয়ে রইলো। অরগ্যান তার নিজের ভাগের ফলগুলি ধুয়ে ফেললেন। দেখা গেলো সেগুলি বেশ ভালোই আছে। হরেক রকম ফল আর আঙুর। তিনি একা একাই সেগুলি খেলেন।*

"এ শহরটির পশ্চিম দিক দিয়ে সিন্ধু নদ বয়ে চলেছে। যে চারটি নদী কৈলাস পর্বত থেকে জন্ম নিয়েছে এটি তার একটি। কৈলাস পর্বতের একটি সিংহের মুখ থেকে এটি নিঃসরিত হয়ে

* মূলে কিছুটা অন্যরকম আছে। কিন্তু তার বাস্তব ব্যাখা এরকমই একমাত্র হতে পারে। অন্যথায় অংশটিকে প্রমাদ দুষ্ট বলে ধরে নিতে হয়।

চলেছে। নদীটি মরিউল বা লাডাক হয়ে হক্রুস বা গিলগিটের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। তারপর কাশ্মীরের উত্তর দিককার জওসদ্‌কর ও পরিগ (কারগিলের একটি জেলা) হয়ে তাজিক বা পারস্যের মধ্য দিয়ে উরগ্যান বা উদ্যান চলে গেছে।"

সিন্ধু নদ পার হবার জন্য যাত্রীরা সবাই মিলে হাত ধরাধরি করে খেয়াঘাটের কাছে এলো। অরগ্যান ও দ্‌পল একটি নৌকায় চেপে বসে মাঝিকে বললেন : 'চলো'।

মাঝি বললো : 'যেতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সবাই বলছে, ওপারে নাকি তুর্কীরা এসেছে। গেলে, খুন হবার ভয় রয়েছে।'

অরগ্যান-পা' সে কথা শুনে ঘাবড়ালেন না। বললেন : 'মরণে আমার ভয়ডর নেই। তুমি নৌকা চালাও!'

মাঝি তার কথা শুনে নৌকা ছেড়ে দিলো।

"এখান থেকে উত্তরমুখী গেলে উরগ্যান বা উদ্যান দেশ। সেখানে ৯০,০০০ শহর আছে। তবে ধুমতাল ছাড়া আর কোন জায়গাকে উরগ্যান বা উড্ডীয়ান বলা হয় না। এ সময় উরগ্যানকে সবেমাত্র তুর্কীরা দখল ক'রে নিয়েছিল।"

নদী পার হয়ে আবার দু'জনে চলতে থাকলো। সন্ধ্যা নাগাদ একটি শহরের দেখা মিললো। নাম তার কলবুর। শহরে ঢুকলেন দু'জনে।

শহরের সব লোক, কি মেয়ে কি পুরুষ, নতুন চেহারার এ দুই তীর্থযাত্রীকে দেখে ভাবলো—এরা নিশ্চয় তুর্কী। ব্যাস! অমনি ওদের উপর তাক ক'রে সবাই ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে দিলো।

নিরুপায় হয়ে দুজনে প্রাণপণে ছুট দিলেন। ছুটতে ছুটতে শেষে সামনে এক বাগান পড়লো, চিন্তা ভাবনা না ক'রে তারই মাঝে ঢুকে পড়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন দুজনে।

রাতের অন্ধকারে কেউ আর ওদের পিছু নিলো না। বোধ হয়

ভাবলো এই আঁধারে কোথায় আর পালাবে লোক দুটো। কাল সকাল হলে ধরা যাবে।

সে পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো বোকামি ওরা করলেন না। রাতে প্রচণ্ড ঝড় দেখা দিলো। আর সেই সুযোগে সবার অলক্ষ্যে চম্পট দিলেন শহর থেকে।

পথে যেতে যেতে খবর পেলেন উদ্যানের ভিতর নাকি পারসিকেরা ঢুকেছে।

চলতে চলতে এক জোড়া দম্পতির সঙ্গে দেখা। তারা তুর্কীদের এড়িয়ে গরু ভেড়া নিয়ে নিজেদের ভিটেয় ফিরে চলছিল। সঙ্গে একটি ছোট্ট শিশু।

তাদের সঙ্গে দু'জনে ভাব জমালেন।

বললেন: আমরা দুজন তিব্বতী সাধু। তীর্থ করতে উরগ্যান চলেছি। ভালোই হলো, তোমাদের সাথে একসঙ্গে ধূমতাল পর্যন্ত যাওয়া যাবে।

স্বামী স্ত্রীকে সাহায্য করতে লেগে গেলেন দুজনে। অরগ্যান-পা' ওদের বাচ্চাটিকে কোলে নিলেন। তারপর দুজনে মিলে ওদের গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চললেন।

সিন্ধু নদ তো আগেই পার হয়েছেন। এবার ভিকরোভস এলেন প্রথমে তারা। তারপর আরো একদিন পথ চলে কবোক (কচোক)।

লবণ চালান প্রসঙ্গে যে দেশটিকে কচোক বলেছেন, তাকেই বোধ হয় অরগ্যান-পা' এখানে কোবোকো বা কবোক বলছেন।

মালকুট বা মলোট শহর থেকে কবোক আসতে দু'জনার পুরো একটি মাস লেগেছে।

"এ শহরটির লোকজনেরা বেশ ধর্মপরায়ণ ও শিক্ষিত। অনেক জ্ঞানী লোকও আছেন এখানে। ক্যারামিনিয়াম (Caraminium) এর খনি রয়েছে। এর শাসনকর্তার নাম রাজদেব। তিনিই উরগ্যানের বেশির ভাগ অঞ্চলের মালিক।"

প্রাসাদে গিয়ে অরগ্যান-পা' তার সঙ্গে দেখা করলেন। 'উদার রাজামশাই' তাদের আদব আপ্যায়ন করলেন, ভোজ খাওয়ালেন বেশ যত্ন ক'রে। তারপর পথ দেখিয়ে ভোনেলে পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য একজন লোকও সঙ্গে দিলেন।

ভোনেলে কবোক থেকে পুরো একদিনের পথ।

পরের অঞ্চলগুলিও যাতে দু'জনে স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন, নিরাপদে ধূমতাল তীর্থ করতে পারেন সেজন্যও শাসনকর্তা একটি চিঠি দিয়ে দিলেন। তাতে তিনি স্পষ্ট ক'রে লিখে দিলেন 'অমুক অমুক জায়গা থেকে অমুক অমুক জায়গাতে এরা যাতে যেতে পারেন সেজন্য যেন লোক সঙ্গে দেয়া হয়।'

ভোনেলে থেকে তারা সিদ্ধপুর গেলেন।

সেখানে বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা করলেন। পথে একটি ছোট নদী পড়লো। সেটি পার হলেন। একদিনের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন করগকর (Karagkar)।

ছোট এই নদীটি খুব সম্ভব ভরঙু। করগকর নামের জায়গাটি করাকর গিরিপথের কাছে থাকা কোন গ্রাম।

সেখানকার লোকের মুখে অরগ্যান-পা' শুনলেন এরপর থেকেই শুরু হয়েছে অন্য রাজ্যের সীমান্ত।

"এ অঞ্চলটিতে চাল ও গমের বেশ ফলন হয়। নানারকম ফল-মূলও রয়েছে। সবখানেই ময়ূরের ঝুঁটির মতো গাছ-গাছালি মাথা উঁচিয়ে আছে।

"মাটির বুকে কোমল ঘাসের আস্তরণ, তরিতরকারী শাক-পাতার গাছ-গাছালি-লতা। সব রকমের রঙীন ও সুগন্ধি ফুল। উরগ্যানের মধ্য দিয়ে একটি নদী চলে গেছে। নামটি তার কোদন্তর। পুব দিকে ইলো পর্বতমালা। এটি জম্বুদ্বীপের সব পর্বত থেকে উঁচু। পৃথিবীর এমন কোন ভেষজ গাছ-গাছড়া নেই যা এখানে হয় না। গাছ-গাছালি, নলখাগড়া, লতা-পাতায় ফুলে জায়গাটি নয়ন ভোলানো।

"অবাধে ঘুরে বেড়ায় শরভ আর নানা জাতের কৃষ্ণসার হরিণ। অজস্র আঙুর ক্ষেত। সব রকমের সুন্দর সুন্দর পাখি আর চোখ জুড়ানো রঙের বাহার মনের মাঝে গুনগুনিয়ে গানের সুর জাগায়।"

উড্ডান রাজ্যের এই ইলো পর্বতকেই চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ হি-লো পর্বত বলে বর্ণনা ক'রে গেছেন।

এখান থেকে পুরো একটি দিন পথ হেঁটে দু'জনে রয়িকর (Rayikar) এলেন।

"এ জায়গাটি রাজা ইন্দ্রভূতির রাজধানী। এখন দু'টি শহরে ভাগ হয়ে গেছে। একটিতে আছে খান ষাটেকের মতো বাড়ি। অন্যটিতে চল্লিশ খানার মতো। উত্তর দিকে রাজা ইন্দ্রভূতির গড়া একটি মন্দির রয়েছে। নাম মঙলয়োর (Mangalaor)। মন্দিরে রয়েছে বুদ্ধদেব, তারা ও লোকেশ্বর (বোধিসত্ত্বের) নানারকম পাথর মূর্তি।"

ইন্দ্রভূতি একজন খ্যাতনামা তন্ত্রাচার্য। তিব্বতীদের মতে তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের উড্ডীয়ান শাখার বিশিষ্ট প্রবক্তা পদ্মসম্ভবের তাত্ত্বিক গুরু।

এখানে পৌঁছতে পেরে অরগ্যানের মনে অপার আধ্যাত্মিক ভাবোচ্ছ্বাস দেখা দিলো। সত্যি কথা বলতে কি, যখন থেকে তিনি উরগ্যান বা উড্ডান রাজ্যে পা রেখেছেন সেই থেকেই তিনি ভাবের জোয়ারে ভেসে চলেছেন।

তার বদ্ধমূল ধারণা এ দেশ বাসনা-কামনাপ্রবণ সাধারণ মানুষের জন্য নয়। ওই ধরনের সাধারণ আকাঙ্খা দেখা দিলেই 'প্র-মেন-ম' নামের মানুষ খেকো ডাকিনীরা মোহিনীরূপ ধরে তোমার কাছে হাজির হবে। তুমি হবে শেষে তাদের রক্তমাংসের ভোজ উৎসবের শিকার।

রয়িকরের কাছ দিয়ে একটি ছোট নদী বয়ে চলেছে। হেঁটে এপার ওপার হওয়া যায়। দক্ষিণ দিকে গেছে নদীটি। পার হয়ে ওপার গেলে এক পাহাড়ের অংশবিশেষ চোখে পড়বে। দেখলে মনে

হবে এটি যেন পাহাড়ের গায়ে দেখা দেয়া আবের মতো একটি বাড়তি অংশ। মহাসিদ্ধ লাভা-পা' এখানে বাস করতেন।

লাভা-পা' যখন এখানে, এক ডাকিনী জায়গাটির উপর পাথর বৃষ্টি শুরু করলো। কিন্তু মহাসিদ্ধ লাভা-পা'র সঙ্গে পারবে কেন? তিনি তর্জনী মুদ্রা করতেই পাথরগুলো আকাশেই থমকে রইলো। সব ডাকিনীকে আচার্য তারপর মন্ত্রবলে ভেড়া বানিয়ে দিলেন।

দেখা গেলো, সারা দেশে আর একটি মেয়েও নেই। ডাকিনী ব'লে সব মেয়ে ভেড়া হয়ে গেছে। পুরুষদের চোখ কপালে উঠলো। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেলো দেশ জুড়ে। দল বেঁধে সবাই মেয়েদের খুঁজে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু কোথাও তাদের দেখা পাওয়া গেলো না।

আচার্য এদিকে সবগুলো ভেড়ার গায়ের লোম কেটে নিলেন। তাই দিয়ে চমৎকার একখানা পশমী কম্বল বানিয়ে গায়ে জড়ালেন। এজন্যই সবাই তাকে লাভা-পা' বা পশমী কম্বলের মানুষ নাম দেন।

এদিকে খুঁজে খুঁজে কোন মেয়ের যখন দেখা পাওয়া গেলো না, তখন আসল ঘটনা পুরুষদের আর বুঝতে বাকী রইলো না। তারা লাভা-পা'র কাছে এলেন। তাকে শ্রদ্ধা, সম্মান, স্তুতি জানিয়ে মেয়েদের ছেড়ে দেবার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে থাকলেন।

লাভা-পা' বললেন: বেশ। এতো ক'রে যখন বলছো সবাই, ছেড়ে দেবো মেয়েদের। তবে সর্ত আছে। যদি তা মানতে রাজী থাকো তবেই ছাড়বো, নইলে নয়।

পুরুষরা বললে: কী সর্ত বলুন? মানতে রাজী আছি।

লাভা-পা' বললেন: মাথায় জুতো (চামড়ার টুপী?) পরো। নাকে আঙটি লাগাও। সাপের আকারের বন্ধনী ব্যবহার করো।

পুরুষরা এককথায় মেনে নিলো। সেই থেকে এ প্রথা এ দেশে চলে আসছে। আজো চলছে।

উড্ডানের অধিবাসী পুরুষেরা যে গয়না ব্যবহার করতো সে বর্ণনা

মার্কো পোলোর বিবরণেও পাওয়া যায়। আগেই বলেছি, মার্কো উড্ডানকে 'পশই' নামে উল্লেখ করেছেন।

অরগ্যান-পা' দ্‌পলকে সঙ্গে নিয়ে রয়িকর শহর ঘুরে ঘুরে দেখে চললেন। একটি জায়গায় একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো। সেও যে একজন ডাকিনী এ বিষয়ে অরগ্যান-পা'র কোন সন্দেহ ছিল না।

স্ত্রীলোকটি কথায় কথায় ওকে বললো ঃ 'আপনি ইন্দ্রভূতির মতো দেখতে।'

"প্র-মেন-ম' জায়গাটি রয়িকর-এর কাছেই। মায়াবিদ্যার সাহায্যে কী ক'রে যেমন ইচ্ছা যে কোন মূর্তি ধারণ করা যায় সে কথা সেখানকার সব মেয়েরাই জানে। রক্ত ও মাংস তাদের বেজায় পছন্দ। যে কোন প্রাণীর বল ও জীবনীশক্তি শুষে নেবার ক্ষমতা আছে তাদের।"

রয়িকর থেকে এবার দু'জনে ধূমতাল রওনা হলেন। একবেলা পথ চলার পর সেখানে পৌঁছে গেলেন।

যে স্থানটিকে দেখার জন্য সব রকম কষ্ট আর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এতদূর আসা, সেখানে পা দিয়ে দু'জনের আর আনন্দ ধরে না। ...এই...এই...সেই অলৌকিক দেশ! উরগ্যান-এর হৃদয়।

যেন স্বপ্নের মধ্যে পা ফেলে ফেলে দু'জনে আর্যভট্টারিকার মন্দিরে এলেন। মূর্তিটি চন্দন কাঠ দিয়ে গড়া। এখানকার লোক তাকে মঙ্গলাদেবী বলে।

দেবী মূর্তির দিকে চেয়ে, দেখে দেখে যেন আর মন ভরে না অরগ্যান-পা'র। দিন শেষ হলো। রাত নেমে এলো। বিহ্বল তীর্থযাত্রী মন্দির প্রাঙ্গণেই রাত কাটিয়ে দিলেন।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে হঠাৎ অরগ্যান-পা'র ঘুম ভেঙে গেলো। আর ঘুম এলো না। মন ডাক দিয়ে চললো নিশ্চয়ই কোন একটা বিপদ আসছে সামনে।

ভোরবেলা দ্‌পলকে শোনালেন স্বপ্নের কথা। বললেন : দু'খানা গাছের ডাল জোগাড় করে দু'খানা লাঠি বানিয়ে নাও। স্বপ্ন যে সব সময় সত্যি হবে তার অবশ্য কোন মানে নেই। কিন্তু কথায় আছে, সাবধানের মার নেই!

দ্‌পল অরগ্যানের কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। লাঠি বানানোর উপদেশ মোটেই কানে নিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে দু'জনে দু'দিকে ভিক্ষায় বার হলেন। দ্‌পল উত্তর দিকে। অরগ্যান দক্ষিণ দিকে। কিছুটা এগিয়ে যেতেই অরগ্যান কয়েকজন রমণীর দেখা পেলেন। সন্ন্যাসী দেখে তারা তার গায়ে ফুল ছড়ালো, তন্ত্রের নানারকম মুদ্রাভঙ্গিমা সহ কপালে সিঁদুরের তিলক এঁকে দিলো।

এরা যে ডাকিনী এবং এভাবে তারা যে তার উপর দৈব আশীর্বাদ ঝরিয়ে চলেছে এতে তার একটুও সন্দেহ রইলো না। অরগ্যান-পা'র মনে হলো এর ফলে তার আধ্যাত্মিক শক্তি, আত্মিক মনোবল ও জীবনীশক্তি যেন বহুগুণ বেড়ে গেলো। সে উৎফুল্ল মনে আরো এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকার কানে বিঁধলো। দ্‌পলের গলা না? তাড়াতাড়ি অরগ্যান দ্‌পল যেদিকে গেছেন সেদিক পানে ছুটে গেলেন।

গিয়ে দেখেন, একদল লোক লাঠি সোঁটা ও আরো নানা অস্ত্র নিয়ে দ্‌পলকে ঘেরাও করেছে। সবাই তাকে এই মারে কি সেই মারে।

বেচারা হাউমাউ ক'রে তিব্বতী ভাষায় চেঁচিয়ে চলেছে। কিন্তু কে বুঝবে সে ভাষা! অরগ্যান তাকে বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। সবাইকে বুঝিয়ে বললেন—ও তার সঙ্গী। দু'জনে মিলে এখানে তীর্থ করতে এসেছে। অন্য কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই।

তখন দ্‌পলকে সবাই ছেড়ে দিলো।

"এ শহরটিতে পাঁচশোর মতো বাড়ি-ঘর। সব মেয়েই মায়াবিদ্যায় পটিয়সী।"

"যদি তুমি কোন মেয়ের কাছে গিয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করো, সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দেবে—'আমি যোগিনী'।"

সেদিন রাতে আবার আগের দিনের মতো মঙ্গলাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে দু'জনে শুয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে একজন স্ত্রীলোক ওর কাছে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো: মেয়ে চাই নাকি গো? তাহলে আমার সঙ্গে এসো। খাসা মেয়ে আছে।

অরগ্যান-পা' বুঝলো: এ একজন দুষ্ট প্রকৃতির ডাকিনী। প্রলোভন দেখিয়ে ওর আধ্যাত্মিক শক্তি শুষে নিতে চায়। হয়তো ওর রক্ত মাংস খাবার দিকেও চোখ রয়েছে। তাড়াতাড়ি লাঠি উঁচিয়ে তাড়া লাগায় স্ত্রীলোকটিকে।

ওর ওই উগ্রমূর্তি দেখে পলকে সে উধাও হলো।

প্রলোভন জয়ের প্রতিদান পরদিনই পাওয়া গেলো। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ওরা দু'জন যখন মন্দির প্রাঙ্গণে বসে আছেন, একজন স্ত্রীলোক পূজাসম্ভার নিয়ে ওদের কাছে এলো। সামনে ধূপ ধুনা জ্বালিয়ে, দু'জনার গায়ে ফুল ছড়ালো, প্রণাম জানিয়ে সম্মান দেখালো।

এ যে নৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখারই মহৎ স্বীকৃতি তা অরগ্যান-পা'কে কারো বলে দেবার প্রয়োজন হলো না।

"এ শহরে একজন স্ত্রীলোক আছে যার তিনটে চোখ। আরেক জনের কপালে একটি লাল স্বস্তিক চিহ্ন ফুটে উঠেছে। দেখলে মনে হবে বুঝি বা সিঁদুর দিয়ে আঁকা হয়েছে।"

এই দ্বিতীয় রমণী তাকে বললো: আমি পুরোপুরি নিজের চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করে যোগিনী হয়েছি। যে জিনিষ তুমি দেখতে চাও না কেন, আমি দেখাতে পারি।

ওর কথা শুনে, এক তাতার বলে উঠলো: তাই নাকি? বেশতো, তুমি যদি সত্যি সত্যিই সিদ্ধ যোগিনী, তাহলে আমার দেশ থেকে কিছু একটা জিনিষ এনে দেখাও দেখি।

ওর কথা শেষ হতে না হতে রমণীটি একটি ধনুক ও একটি তুর্কী টুপী হাজির করলো।

এ অবাক কাণ্ড দেখে তাতারটির মুখে আর কথা সরলো না।

পরে, ওই তাতারটির কাছ থেকেই অরগ্যান জানলো, এ স্ত্রী-লোকটি নাকি ধূমতাল্গের রাজার স্ত্রী ছিল।

অরগ্যান লোকমুখে শুনতে পেলো, এ শহরে নাকি একজন খুব উঁচুদরের সিদ্ধা যোগিনী আছে। সে যে কে আর কোথায় থাকে তা কেউই বলতে পারলো না। সত্যিকারের সিদ্ধা যোগিনীর দেয়া খাদ্য খেলে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ ঘটে। তাই অরগ্যান-পা' ধূমতাল শহরে এক বিচিত্র অভিযান শুরু করলেন। ঘুরে ঘুরে শহরের প্রত্যেকটি বাড়িতে তিনি হাজির হয়ে প্রত্যেক রমণীর কাছে আহার্য ভিক্ষা ক'রে চললেন।

তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে এর ফলে তিনি প্রভূত আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেছেন এবং চরম সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছেন।

এই প্রসঙ্গে তার একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। তিনি যখন কবোক শহরে তখন একজন রমণী তাকে একবাটি ঝোল খেতে দিয়ে-ছিল। রমণীটির নাম সলুন্ত পুচ। যেই তিনি তার দেয়া ঝোল খেলেন অমনি তার মনে হতে লাগলো যে, সমস্ত জায়গাটি যেন থর থর করে কাঁপতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

এখানকার চার মহাযোগিনী বিশেষ নাম করা। এরা হলেন—সোনি, গোম্বুরী, মতঙ্গী ও ত-সসি।

সোনি তিব্বতে হগ্রো ব্জঙ নামে পরিচিত। সে দেশে তার বিশেষ জনপ্রিয়তা রয়েছে। তার জীবনী তিব্বতী সাহিত্যের এক-খানি নামকরা বই।

ধূমতালের পশ্চিম দিকে কমকোঙ্ক (বা কমধোক) নামে একটি তুষারাবৃত পর্বত রয়েছে। এ দেশের লোকেরা বলে, সে পর্বতটি নাকি

যোগিনীদের আবাস। পর্বতটির মাঝে সাধু কমলনাথের গুহা। সেখানে ক্রোধের একটি নীল-রঙা মূর্তি রয়েছে। তার দেহের আভরণ মানুষের হাড়গোড় দিয়ে তৈরী। মূর্তিটির তিনটি চোখ। চোখগুলি দিয়ে যেন সূর্যের আলোর মতো দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে। মূর্তিটির এক হাতে তরবারি অপর হাতে নরমুণ্ড।

দ্‌পল ইয়ে তাকে দেখে ভাবলেন মূর্তিটি বুঝি সম্বরের।

এ জায়গাটির পূব দিকে একটি শ্মশান আছে। নাম তার ভিরস্‌মস বা ভিরমশান। শুয়োর, বিষধর সাপ, চিল, কাক, শিয়াল প্রভৃতির রূপ ধরে ভয়ংকর সব যোগিনীরা সেখানে একত্র হয়।

একটুখানি উত্তর দিকে শ্মশানের বৈশিষ্ট সূচক আট রকম গাছের মধ্যে একটিকে দেখা যাবে। এ গাছটির নাম 'ওকোস'।

শ্মশানের কিছুটা দক্ষিণে ক্ষেত্রপালের একটি পাথর প্রতিমা রয়েছে। নাম তার ধ্রুমনথু।

ওকোস গাছটির কাছে কপলভোজন নামে একটি পাথরের উপর ব্রহ্মা, রুদ্র ও অন্যান্য সব দেবতাদের বিগ্রহ। কাছেই মঙ্গলবৃক্ষ নামের একটি তাল গাছ। পাশ দিয়ে একটি প্রস্রবণ বয়ে চলেছে। গতি তার দক্ষিণ দিকে। এটির নাম মঙ্গলপাণি।

পূব দিকে একটি ছোট পাহাড়। নাম শ্রী পর্বত। এখানে অনেক সেঙলডঙ গাছ জন্মায়।

সেঙলডঙ নামটি দিয়ে অরগ্যান বোধহয় খদীর গাছকে বোঝাতে চেয়েছেন।

"এর পশ্চিম দিকে মঙ্গলপাণি নদী মধ্যে একটি ব-দ্বীপ রয়েছে। নাম মূলসই কোট (?)। এখানে আর্য-ভট্টারিকার একটি প্রতিমা আছে। তবে, তাতার সৈন্যদের ভয়ে সে এখন ধূমতালে বাস করছে।"

"এই প্রতিমাটির কাছে মেয়েরা পূজা দিতে আসে। 'কিলংসিলি' মন্ত্রপাঠ করে তারা তাকে অর্ঘ নিবেদন করে। যারা বলহীন, যেসব লোক দুঃখ-কষ্ট-পীড়নের মধ্যে রয়েছে তারা এর ফলে সুদিনের দেখা পায়।"

এখানকার শ্রীপর্বতটি ভারতের ১২টি শ্রীপর্বত মধ্যে প্রধান। এই পাহাড় কোলের উপত্যকাটি শ্রী নামে পরিচিত।

একটি খবরের মতো খবর জানাতে ভুলে গেছি।

"যে সময় উরগ্যানের ফটকের কাছে (রয়িকর) যাই তখন ইন্দ্রভূতির তৈরী মন্দিরে আমরা কয়েক রাত কাটাই। সেখানে অনেক ডাকিনী সমবেত হতো ও ধর্ম-ব্যাখ্যান করতো।"

এই হলো অলৌকিক দেশ উরগ্যান।

"কি মেয়ে কি পুরুষ তন্ত্রবিদ্যায় পটু সকলেই এখানে ত্রিস্থানের ডাকিনীদের কাছ থেকে নির্দেশাদি লাভ ক'রে থাকে। তা না হলে তন্ত্রের গুহ্য পথের সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগ রচনা করা কীভাবে সম্ভব হতো?"

কিছুদিন ধূমতালে কাটাবার পর দ্‌পল ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু অরগ্যান-পা' ওর কথা কানে তোলেন না। তিনি তখন ধূমতালের সর্বত্র অলৌকিকত্ব দেখে বেড়াচ্ছেন। তারই ভাবের ঘোরে তিনি বিহ্বল।

দ্‌পল তখন তাকে বললেন: "দেখুন, আমিও এ সবে বিশ্বাস করি। কিন্তু তাই বলে তো আর চিরকাল এখানে পড়ে থাকতে পারি না। এবার তিব্বত ফিরে চলুন।

অরগ্যান-পা' জবাব দিলেন: নিজের জীবনের কথা একটিবারও না ভেবে অতো দূর দেশ থেকে এখানে আমি এসেছি। উপকৃত-ও হয়েছি। সব থেকে ভালো হচ্ছে বাকী দিনগুলো এখানে কাটিয়ে এখানেই শেষ নিশ্বাস ফেলা। তা যদি না হয়ে ওঠে, তাহলেও যে করে হোক অন্ততঃ তিনটি বছর এখানে আমি কাটাতে চাই।

দ্‌পল বললেন: যদি আপনার সত্যিই যাবার ইচ্ছে নেই জোর করবো না। সেক্ষেত্রে আমাকে অন্ততঃ রজহুরা পর্যন্ত এগিয়ে দিন।

অগত্যা সেই প্রস্তাবে মত দিলেন অরগ্যান। দ্‌পল ইয়েকে রত্নহুরা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য তার সঙ্গী হলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্‌পলকে একা ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসতে পারলেন না অরগ্যান। সঙ্গের অন্যসব পথযাত্রীরা, যাদের বণিক বলেই তার মনে হলো, দ্‌পলকে একা ছেড়ে দিতে নিষেধ করলো। তারা সকলেই বলতে থাকলো : আপনার এ বন্ধুটি এখানকার ভাষা জানেন না বা বোঝেন না। ফলে কোথাও তিনি ভিক্ষে পাবেন না। আপনি সঙ্গে না থাকলে তাকে অনেক দুর্ভোগ পেতে হবে।

অরগ্যান-পা' তখন চিন্তায় পড়লেন। দু'জনে তারা একই গুরুর শিষ্য। অনেক দূর দেশ থেকে তারা একসঙ্গে এখানে তীর্থ করতে এসেছেন। এ অবস্থায় এক বন্ধুকে জেনেশুনে একাএকা এভাবে বিপদের মুখে ছেড়ে দেওয়া খুবই লজ্জার, অমানবিকতার ব্যাপার হবে।

তাই বাধ্য হয়ে শেষে তিনিও ফিরে চললেন।

পাঁচ দিনের দিন তারা ঘরি নামে একটি শহরে এলেন।

সেখান থেকে সাতটি দিন আরো পূবদিকে এগিয়ে চলার পর উপস্থিত হলেন উরশর বা উরশা-তে।

দক্ষিণ দিকে একটি ভয়ংকর শ্মশান। কতক বণিককে সঙ্গে নিয়ে তারা সেখানে গেলেন। ঠিক করলেন সেখানেই রাত কাটাবেন। বণিকেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। বললো, : ভূত এসে লোকজনদের মেরে ফেলবে।

অরগ্যান-পা' আশ্বাস দিয়ে বললেন : "ভয় পেয়ো না। ভূতের হাত থেকে আমি তোমাদের বাঁচাবো।"

যাইহোক, দণ্ডের (নীলদণ্ড) আশীর্বাদে শেষ অবধি কোন অঘটনই ঘটলো না।

হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ অনুযায়ী, : উরশ রাজ্যটিতে পাহাড় ও উপত্যকা যেন পর পর সাজানো। চাষ উপযোগী জমির পরিমাণ

বেশ কম। জমি ফসল উৎপাদনের উপযোগী। তবে ফল ও ফুল খুব কম হয়। অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নয়। তার সময়ে এ রাজ্যটি কাশ্মীরের অধীন ছিল।

এ অঞ্চল দিয়ে যাবার পথে অরগ্যান-পা' অনেক শস্যক্ষেত্র দেখলেন। কিন্তু এ সব ফসলের যে কোন মালিক আছে তা তার মনে হলো না। যে কেউ ইচ্ছে করলেই অনায়াসে তা নিয়ে চলে যেতে পারে।

উরশা থেকে তিনদিন পথ চলার পর তারা পৌঁছলেন এসে ৎসি-ক্রো-ত। এখানে পাহাড়ের উপর থেকে একটি বড়ো নদী নেমে এসেছে।

নদীটি নিঃসন্দেহে বিতস্তা। যে জায়গাটিতে তারা পোঁচেছেন; সেটি বোধহয় মুজফ্ফরাবাদের কাছে।

এখানে এসে দলের একজন বণিক রোগের প্রকোপে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে দলের অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে প্রচণ্ড মারামারি জুড়ে দিলো। দু'জন সঙ্গীকে সে মেরে ফেললো, আর একজনকে জখম করলো।

বোধ হয় সঙ্গের কতক লোক এর একটা কিছু প্রতিকারের জন্য অরগ্যান-পা'কে ধরলো। অরগ্যান-পা' তন্ত্রের শরণ নিলেন। গুহ্য-পতির ধ্যান জুড়ে দিলেন তিনি। এরপর সম্মোহনের দ্বারা বণিকটিকে বশে আনলেন। ফলে সে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়লো। 'এমনটি না করলে দলের সবাই হয়তো পরস্পরের সঙ্গে মারামারি ক'রেই সাবাড় হতো।'

নদীর কূল বরাবর পথ চলে ৎসি-ক্রো-ত থেকে একদিনেই তারা রমিকোটি এলেন। নদীর অন্য পাড়ে রশ্মিশ্বরী (রামেশ্বর)। এটি বজ্রকায়ের ২৪টি পীঠের একটি। দুই ভুরুর মধ্যস্থান। সেখানে কাশ্মীর থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা নদী (বিতস্তা) ও একটি পুকুরের মাঝে দুই ভুরুর মধ্যস্থানের মতো একটি জায়গা আছে।

রামেশ্বর একটি প্রসিদ্ধ তন্ত্রপীঠ। এটি মূলতঃ দক্ষিণ-ভারতে।

কিন্তু তিব্বতীয় লেখকেরা সবগুলি তন্ত্রপীঠকেই পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে নির্দেশ করেছেন। ফলে তাদের রামেশ্বর দক্ষিণ-ভারতে নয়, বিতস্তা নদীকূলে।

রশ্মিশ্বরী বা রামেশ্বর গ্রামের একটি পরিবার তাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালেন। তাদের জন্য যব দিয়ে মদ তৈরী ক'রে তাও পানার্থে দিলেন।

কাশ্মীর থেকে নেমে আসা বিতস্তা নদীর ডান তীর ধরে এবার তারা এগিয়ে চলেছেন। ন'দিন পর একটি সংকীর্ণ উপত্যকার দেখা মিললো। নাম তার র্‌দোরজ্রেমুল। অর্থাৎ বরাহমূল বা বরমূলা।

এরপর পা দিলেন তারা কাশ্মীর রাজ্যে।

"এ দেশটির ভূ-ভাগ হাতের তালুর মতো সমতল হয়ে পূব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরদিকে আকাশের মতো নির্মল একটি হ্রদ। নামটি তার কমপর। সুন্দর সুন্দর ফুলের জন্য জায়গাটির মন মাতানো চেহারা। দামী দামী নানা গাছে চারিদিক ঘন আবৃত। ফলের ভারে গাছগুলি অবনত। সব রকম পাকা ফসলে দেশটি শস্য-শ্যামল, সব কিছু ধন-সম্পদে ভরা। শাক্য মুনির মতধারার রত্নগর্ভ থেকে উৎসারিত জ্ঞানের আকর এ দেশটি। প্রত্যেকেই শ্বেত ধর্ম পালন করে। প্রজ্ঞা পারমিতার ভবিষ্যদ্বাণীতে এ স্থানটির নাম ক'রেই বলা হয়েছে : জায়গাটিতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতের আবাস।"

অরগ্যান-পা' যে হ্রদটিকে 'কমপর' বলেছেন, সেটি আসলে কমল সরোবর বা উলার হ্রদ।

এবার এলেন তারা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে।

"এখানে ৩৬ লক্ষ লোকের বাস। মোঙ্গলদের আক্রমণের ফলে অনেক কমে গিয়ে এখন মাত্র তিন লক্ষে দাঁড়িয়েছে।"

অধিবাসীর সংখ্যা এখানে বেলুনের মতো ফাঁপানো হলেও, মোঙ্গল আক্রমণের কথা বানানো বলে মনে করার মতো কোন কারণ

নেই। ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের রাজা লক্ষ্মণদেব তুরুস্কু নায়ক কজ্জলের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। কজ্জল কাশ্মীর অধিকার ক'রে ১২৫৯ থেকে ১২৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কবি আমীর খসরু কজ্জলকে 'খজলক' বলে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, তিনি ছিলেন মোঙ্গল অভিযানকারীদের নেতা।

মার্কো পোলোও কাশ্মীরের উপর মোঙ্গলদের এক অভিযানের কথা বলেছেন। এই অভিযানের নেতার নাম ছিল নোগোদর। তিনি অরিয়র-কাশ্মীর অধিকার করেন ও আসেদিন সোলদান (গিয়াসুদ্দীন সুলতান?)-এর কাছ থেকে (ঝিলম নদীর তীরে থাকা?) দলিবর জয় ক'রে নিয়ে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন।

কজ্জল বা খজলকের হাতে রাজা লক্ষ্মণদেবের মৃত্যুর আগেই অরগ্যান-পা' কাশ্মীর আসেন। কারণ, তার সময়ে কাশ্মীর হিন্দু রাজার অধীনে। তবে, নোগোদরের অভিযান তার আগেই ঘটে থাকতে পারে। যদি তা নাও হয় তাহলেও কাশ্মীর যে তাতার বা মোঙ্গল অভিযানকারীদের নিয়মিত আক্রমণের শিকার হয়ে উঠেছিল এ সময়ে—এতে কোন সন্দেহ নেই।

যাই হোক, তীর্থ যাত্রীরা শ্রীনগর পিছনে রেখে, এলেন এবারে বন্তীপুর। তার মানে অবন্তীপুর। এ অঞ্চটিকে তারা জাফরানের জন্মভূমি বলেছেন। এ বর্ণনা কতো দূর ঠিক বলা কষ্ট। কেননা, জাফরান কেবল পমপুর অঞ্চলে হয় বলেই আমাদের জানা।

এরপর দু'জনে তারা এলেন ভেজিভর। অর্থাৎ বিজয়-জয়েশ্বর বা আধুনিক বিজ-বিয়ার। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা নাকি নয় লক্ষ। যদি পুরো জেলার অধিবাসীর সংখ্যা দিয়ে থাকেন, আলাদা কথা। নয়তো একে অতিরঞ্জিত বলতে হবে।

ভেজিভর এসে অরগ্যান-পা' সম্বর-এর পবিত্র মন্ত্রাদি ও হবুম-মি-শ্রি-ল বা ভূমিশ্রীস ও অন্যান্য পণ্ডিতদের লেখা তন্ত্র পুঁথির খোঁজ করলেন।

সেখানে থাকাকালে একদিন তারা ভিক্ষায় বেরোলেন। যেই শহরে ঢুকেছেন অমনি তাদের মোঙ্গল ভেবে একদল বাচ্চা ছেলে দু'জনের গায়ে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ ক'রে দিলো।

ঢিলের ঘায়ে কাহিল অবস্থা দু'জনেব। কী করবেন, কোথায় ঠাঁই নেবেন কিছুই ভেবে পেলেন না। এমন সময় দুটি মেয়ে এগিয়ে এসে তাদের বাঁচিয়ে দিলো। ছেলেদের কবল থেকে মুক্ত ক'রে এদের নিয়ে গেলো নিজেদের বাড়ির মধ্যে।

ঢিলের হাত থেকে বাঁচলেন বটে, কিন্তু খিদের হাত থেকে কী ক'রে বাঁচেন এখন? অরগ্যান-পা' ভেবেছিলেন, আশ্রয় যখন দিয়েছে খেতেও নিশ্চয়ই দেবে। কিন্তু কই? সে লক্ষণ কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। অসহায়ের মতো বসে রইলেন দু'জনে।

অনেকক্ষণ পর একজন বুড়ো লোক দেখা দিলেন। চাল-চলনে বোঝা গেলো ইনিই বাড়ীর কর্তা। এতোক্ষণ বোধ হয় বাইরে ছিলেন।

তিনি এসে বললেন: অনুগ্রহ ক'রে আমাদের বাড়িতে একটি দিন থেকে যেতে হবে আপনাদের। না হলে বড়োই লজ্জার ব্যাপার হবে। কিছুই তো আদর আপ্যায়ন করতে পারলাম না আপনাদের।

এরপর তিনি দু'জনকে যথারীতি শ্রদ্ধা সম্মান দেখালেন। খাদ্য দিয়ে আপ্যায়নও করলেন। সাধারণ আলাপ আলোচনা কুশল বিনিময়ের পর প্রশ্ন করলেন: আপনারা কে? কোথেকে আসছেন?

অরগ্যান-পা' বললেন: "আমরা ধর্মজ্ঞ তিব্বতী সাধু। উরগ্যান গিয়েছিলাম তীর্থ করতে।"

গৃহকর্তা ওদের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না। সন্দেহ দূর করার জন্য (বৌদ্ধ শাস্ত্রে) অভিজ্ঞ একজন লোককে ডেকে আনালেন।

তিনি এসে গৃহস্বামীর কাছে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। তারপর

দু'জনের উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে বললেন : শুনলাম আপনারা নাকি ধর্মজ্ঞ। তা, কী ধরনের ধর্মশাস্ত্র আপনারা জানেন ?

অরগ্যান-পা' উত্তর দিলেন : "আমি মিঙোন-প', মানে অভিধর্ম শাস্ত্র জানি।"

তখন তিনি অভিধর্মের উপর প্রশ্ন শুরু করলেন। তার্কিক পদ্ধতিতে বেশ কিছুক্ষণ দু-জনের মধ্যে আলোচনা চললো।

আগন্তুক শাস্ত্রজ্ঞ স্বীকার ক'রে নিলেন যে, দু'জনে সত্য পরিচয় দিয়েছেন। সত্যই তারা ধর্মজ্ঞ।

এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ ছাড়া আর কোন শাস্ত্র আপনি জানেন ?

অরগ্যান-পা' বললেন : 'কালচক্র'।

শুনে ভদ্রলোক থ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন : 'ওতো পুরোপুরি এক ভুল ও আজগুবী শাস্ত্র।'

অরগ্যান-পা' জোর প্রতিবাদ তুলে বললেন : 'মোটেই না। এ এক অভ্রান্ত শাস্ত্র।'

তখন তারা আর একজন পণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন। বোধহয় ভালো ভাবে অরগ্যান-পা'র বিদ্যার দৌড় পরখ করবার জন্য।

অরগ্যান-পা' অবশ্য ভাবলো, সে যে সত্যই 'কালচক্রে' অভিজ্ঞ একথা তারা বিশ্বাস করছেন না। ভেবেছেন বোধ হয় মিথ্যা কথা বলেছি। তাই, সত্য-মিথ্যা পরখ করার জন্য এ আয়োজন।

যাইহোক, নতুন ডেকে আনা বিদ্বান ব্যক্তিটি 'কালচক্র' নিয়ে অরগ্যান-পা'র সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনার পর মেনে নিলেন যে, সে সত্যিই একজন বিদ্বান লোক।

এরপর তারা আরো একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ডেকে আনালেন। ইনি কালচক্রের টীকাগ্রন্থ 'বিমলপ্রভা' বইখানি পুরো মুখস্থ বলে যেতে পারেন। তার সঙ্গেও আলোচনা হলো অরগ্যান-পা'র।

গৃহকর্তাও একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। সারা কাশ্মীরে তার খ্যাতি

রয়েছে। অরগ্যান-পা' তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন এবং 'ভালো ভাবেই উতরে গেলেন'।

গৃহকর্ত্রী তাকে প্রশ্ন করলেন: পণ্ডিতজী! এছাড়া আরো কী কী শাস্ত্র আপনি জানেন?

অরগ্যান-পা' হেসে জবাব দিলেন: 'জ্ঞানের লিপ্সা এখন আমি ঘাসের মতো ঝেড়ে ফেলেছি। উরগ্যান গিয়ে, অন্য অন্য সব তীর্থ-ভূমি দেখে সব বিদ্যা ভুলে গেছি।'

সবাই যখন বুঝতে পারলেন যে অরগ্যান-পা' সত্যিকারের একজন তিব্বতীয় পণ্ডিত, তখন তাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে সকলেই খুব খুশী হলেন।

এদিকে, যে বাচ্চা ছেলেগুলি অরগ্যান ও দ্‌পলকে দেখে 'মোঙ্গল' 'মোঙ্গল' বলে পিছু নিয়ে ঢিল ছুঁড়েছিল, তাদের দৌলতে চারিদিকে রটে গেলো যে শহরে দু'জন মোঙ্গল এসেছে। সে রটনা রাজার কানে পৌঁছতেও দেরী হলো না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধরে আনার জন্য চারিদিকে রক্ষী পাঠালেন।

রক্ষীরা চারিদিকে খোঁজ খবর নিতে নিতে প্রায় রাত দুপুরে ওরা দু'জন যে বাড়িতে আছে সেখানে এসে হাজির।

ওরা দু'জন যে মোঙ্গল নয়, তিব্বতী বৌদ্ধ একথা হাজার চেষ্টা করেও গৃহস্বামী রক্ষীদের বোঝাতে পারলেন না। তারা ওই দু'জনকে ধরে নিয়ে যাবেই।

অনন্যোপায় হয়ে গৃহস্বামী রাজপ্রাসাদে ছুটে গেলেন। কিন্তু রাত দুপুর থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত বুঝিয়ে বলে বলেও তিনি রাজাকে বিশ্বাস করাতে পারলেন না যে, ওরা অন্য দেশের, অন্য ধর্মের লোক। ওরা মোঙ্গল নয়।

ওদের দু'জনকে বাড়িতে আশ্রয় দেবার জন্য অন্যরাও গৃহস্বামীকে দোষারোপ করতে শুরু করলো।

দু'জন নিরপরাধ লোককে, বিশেষতঃ গৃহের অতিথিকে কী ক'রে

কোটালের হাতে তুলে দেবেন গৃহস্বামী ? রক্ষা করার আর কোন পথ খোলা নেই দেখে নিরুপায় হয়ে তিনি দু'জনকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন।

বেশ পালটাবার জন্য দু'জনকে কাশ্মীরী পোষাক এনে দেয়া হলো। তাই পরে গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন দু'জনে। সাবধানে সকলের চোখ এড়িয়ে একটি বড়ো নদীর পারে চড়ার কাছে এসে হাজির হলেন। মতলব, পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে ওপার চম্পট দেবেন।

কিন্তু বিধি বাম। নদী পার হবার জন্য পা বাড়াতে গেছেন এমন সময় জনা তিরিশেক রক্ষী এসে ওদের ঘিরে ফেললো।

'আরে! এইতো সেই মোঙ্গল দু'টো!' রক্ষীদের মধ্যে কয়েক-জন চেঁচিয়ে উঠলো। 'এদেরই তো খুঁজে চলেছি আমরা।'

টান মেরে ওদের গা থেকে কাশ্মীরী পোষাক কেড়ে নিলো তারা। তারপর তরবারি উঁচিয়ে, ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেলো নদীর কাছে থাকা ওদের ঘাঁটিতে।

'আমাদের ধরলে কেন? কী করতে চাও আমাদের নিয়ে তোমরা?' অরগ্যান-পা' প্রশ্ন করলেন ওদের।

'তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে ও মেরে ফেলা হবে।' একজন রক্ষী রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিলো।

'হ্যাঁ।' সায় দিলো আর একজন। 'তার আগে তোমাদের নিয়ে আর কিছুই করার নেই আমাদের। অবশ্য যদি তোমরা কোন রকম গণ্ডগোল না ক'রে ভদ্র আর শান্ত থাকো।'

'বেশ! রাজার কাছেই নিয়ে চলো আমাদের।' বললেন অরগ্যান-পা'। 'যদি সত্যিই তার সামনে আমাদের হত্যা করা হয়, তাহলে এদেশে মরতে পেরে খুশী হবো।'

কিন্তু তক্ষুণি ওদের রাজার কাছে নিয়ে যাবার কোন গরজ তাদের মধ্যে দেখা গেলো না। রক্ষীদের হাবভাব, কথাবার্তা শুনে বোঝা

গেলো এখনো তাদের পাহারার পালা শেষ হয়নি। পরবর্তী দল এলে তারপর এরা ঘাঁটি ছাড়বে। তখনই ওদের নিয়ে যাবে রাজার কাছে। তবে ওদের বন্দী করার খবর বোধ হয় ইতিমধ্যে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

ঘাঁটির মেঝেতে মাটির উপর উপুড় হয়ে দু'জনে শুয়ে পড়লেন। দু'হাত ভাঁজ ক'রে তার উপর মাথা রেখে চেষ্টা করলেন ঘুমোবার। এছাড়া এখন আর কী-ইবা করার আছে ?

একে দিনের বেলা। তায় বন্দী অবস্থা। ঘুম কি চাইলেই আসে। তবুও শুয়ে থাকে দু'জনে।

রক্ষীরা ওদের নিঃসাড় প'ড়ে থাকতে দেখে বোধ হয় ভাবলো যে ঘুমিয়েছে। একজন প্রস্তাব দিলো, ওরা যতক্ষণ ঘুমিয়ে আছে, চলো এই ফাঁকে আমরা খেয়ে আসি।

হ্যাঁ, সেই ভালো ! অন্যেরা সায় দিলো।

দল বেঁধে খাবার জন্য বেরিয়ে গেলো সবাই।

ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হলো। দু'জন বন্দীকে যে ওরা সত্যিই এভাবে ফেলে রেখে যাবে তা স্বপ্নেও তাদের ভাবনায় আসেনি। পিট পিট ক'রে চোখ মেলে তাই চারিদিক একবার ভালো ক'রে দেখে নিলেন দু'জনে। যখন দেখলেন সত্যিই কেউ নেই আর দরজাটাও হাট হয়ে খোলা, দু'জনে একটুও সময় নষ্ট করলেন না। পড়ি মরি লম্বা ছুট লাগালেন। ভাগ্যগুণে বাইরে তখন জোর ঝড়-বাতাস। মেঘে আর ধূলোয় চারিদিক প্রায় অন্ধকার। কে আর তাদের নাগাল পায় !

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়লেন তারা দু'জনে একটা নদীর পাড়ে। এ আগের সেই নদী নয়। কিংবা সে নদী হলেও সে জায়গা থেকে অনেক দূরে। জল খুব ধীরে বয়ে চলেছে। গভীরতাও বেশি নয়। সৌভাগ্যই বলতে হবে। হেঁটে হেঁটে পার হয়ে গেলেন অরগ্যান আর দ্‌পল।

এবার জোরে পা চালিয়ে গরু ভেড়া চরে বেড়ানো একটা মাঠের মাঝে এসে পড়লেন। দেখলেন—ভেড়াগুলোকে মাঠে চরতে ছেড়ে দিয়ে কতক রাখাল ছোকরা এক জায়গায় জটলা করছে। নির্বিচারে তাদের সাথে ভাব জমিয়ে সারাদিনটা তাদের মাঝেই দু’জনে কাটিয়ে দিলেন। রাতে খোলা আকাশের নিচে একটা খড়ের গাদার ’পরে ঘুম লাগালেন এই মাঠের মধ্যে।

পরদিন ভোরে ভিক্ষার জন্য ঘুরলেন গ্রামের মধ্যে দু’জনে মিলে। ওদের প্রায় উলঙ্গ অবস্থা দেখে, এক বাড়ি থেকে একজন কতক ছেঁড়া কাপড়চোপড় দিলো। ভিক্ষে ক’রে খাবার মতোও মিলে গেলো কিছু।

অরগ্যান-পা’র এই কাশ্মীরী-আখ্যান আজগুবি মনে হতে পারে। কিন্তু তাই বলে, একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়।

একাদশ শতাব্দীর আরম্ভে সুলতান মামুদ লাহোর ও মূলতান অধিকার এবং বার বার ভারত লুণ্ঠন শুরু করার কাল থেকেই কাশ্মীরে বিদেশীদের ও বিশেষভাবে তাতার, মোঙ্গল, আরব প্রভৃতি মুসলমানদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অলবেরুনীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে শুধু বিদেশীই নয়, অপরিচিত হিন্দুদেরও সে সময়ে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। কারণ সহজেই অনুমেয়। কাশ্মীরের স্বাধীনতা ও হিন্দু পরম্পরা রক্ষা করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতে মুসলমান আধিপত্য যতো বেশি শিকড় ছড়িয়েছে, কাশ্মীরে এই নিষেধাজ্ঞা ততো বেশি জোরদার করার প্রয়োজন হয়েছে। অরগ্যান-পা’র নিজের বিবরণ থেকেই আমরা আভাস পেয়েছি যে, তার কাশ্মীর আগমনের কিছুকাল আগেই কাশ্মীরে মোঙ্গল অভিযান ঘটে গেছে। এ ক্ষেত্রে অরগ্যান-পা’ ও দ্‌পল ইয়েকে বন্দী করতে চাওয়া রাজার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আবার তিব্বতীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ না থাকার দরুন তাদের তাতার কিংবা মোঙ্গল বলে ভুল করাও আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

বরঞ্চ যতো সহজে দুই তীর্থযাত্রী রক্ষীদের কবল থেকে পালিয়েছেন বলে বর্ণনা করেছেন তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। তা যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে যে সেনা বা রক্ষী বাহিনী মধ্যে কর্তব্যে অবহেলাই শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের পতন ডেকে এনেছিল।

আবার এগিয়ে চলেছেন অরগ্যান-পা'। এগিয়ে চলেছেন দ্‌পল ইয়ে। চলতে···চলতে···চলতে···ফারকোট পরা একদল মেয়ের সঙ্গে দেখা। তারাও চলেছে···। তাদের সঙ্গে মিশে তারাও চলেছেন। সামনে কাশ্মীর প্রান্তের এক গিরিপথ।

গিরিপথ যখন পার হতে চলেছেন দেখেন, চলেছে মেয়েদের এক মিছিল। কম করেও বোধ হয় ৫০০ রমণী। সকলের পিঠে খোলা চুল। তাদের কতক অরগ্যান-পা'কে প্রশ্ন করলে: আপনারা কোথা থেকে এসেছেন ? যাবেন কোথায় ?

অরগ্যান-পা' উত্তরে বললেন: তীর্থ ক'রে উরগ্যান থেকে ফিরছি। যাবো স্‌বুদ বক্র।

স্‌বুদ বক্র র্‌গদ তসঙ পা'র বাসস্থলী।

শুনে তারা বলে উঠলো: "হে মহাত্মা! আপনার অভীষ্ট তো তাহলে পূরণ হয়ে গেছে।"

বলেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেলো। অরগ্যান-পা' অবাক চোখ মেলে খুঁজে বেড়ালেন তাদের। কিন্তু কোথায়! ৫০০ রমণীর দীর্ঘ মিছিল কোথায় নিমেষে হাওয়া হয়ে গেছে।

"ওই মেয়েরা তবে কি ডাকিনী ছিল ?"

অরগ্যান-পা'র মুখে পরে এ কাহিনী শুনে মকন পো ব্‌স্‌গ্রুব রিঙ তাকে প্রশ্ন ক'রেছিলেন।

অরগ্যান-পা' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন: তাই-ই আমার ধারণা। সেই রকমটি দেখাচ্ছিল ওদের।

আমরা কি এ কাহিনীটি অবিশ্বাস করবো ? অরগ্যান-পা'র মতিভ্রম বা দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল বলবো ?

যে যা খুশী ভেবে নিন, কিছু আসে যায় না।

গিরিপথ পার হয়ে, হেঁটে···হেঁটে···হেঁটে শেষে তীর্থযাত্রী এক-দিন জালন্ধর পৌঁছে গেলেন। ঠিক করলেন এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নেবেন।

দিনকতক বাদে একদল কাশ্মীরী বণিক সেখানে এলো। তাদের ছু'জনকে দেখে ওরা জিজ্ঞাসা করলো: কোথা থেকে এসেছেন আপনারা?

আমরা তিব্বতী সাধু। ওদের জিজ্ঞাসা মেটাতে জবাব ছিলেন অরগ্যান-পা'। গিয়েছিলাম উরগ্যান-এ তীর্থ করতে। ফেরার পথে কাশ্মীর হয়ে এলাম। তা, তোমাদের রাজা তো আমাদের ছু'জনকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিলেন।

তারা বিহ্বল দৃষ্টিতে অরগ্যান-পা'র দিকে তাকিয়ে বললো: আপনারা বোধহয় সিদ্ধ? তাই না? রাজা যখন আপনাদের ধরতে পাঠালেন, সে সময়ে আকাশের বুক থেকে এক ইন্দ্রধনুকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

অভিভূত মন নিয়ে তারা অরগ্যান-পা'কে অমেয় শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখালো, নানা জিনিষ তাকে উপহার দিলো।

উরগ্যান দেখে ফেরা এক তিব্বতী সাধুরূপে এরপর চারিদিকে তার নাম রটে গেলো। জালন্ধরে থাকাকালেই তিনি ধীরে ধীরে বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠতে থাকলেন। সবাই বলাবলি করতে থাকলো: তিনি অলৌকিক শক্তি লাভ করেছেন।

এ অরগ্যান-পা' সম্পর্কে আমার কথা নয়, তার নিজের মুখের কথা। তার মুখ থেকে শুনে তার এক শিষ্য সযত্নে লিখে রেখে গেছেন।

জালন্ধরে কিছুকাল বিশ্রাম নিয়ে তারপর একদিন মরিয়ুল বা লাডাক ফিরে গেলেন অরগ্যান-পা' ও দ্‌পল ইয়ে।

অরগ্যান-পা'র নিজ মুখে বলা ও তার 'অজানা' শিষ্যের লিখে রাখা কাহিনী এখানেই শেষ।

কিন্তু অরগ্যান-পা'কে নিয়ে আমাদের কাহিনী শেষ হয়নি।

এই সময় থেকে লাডাক ও তিব্বতের পুরো তিব্বতী সমাজে তিনি অরগ্যান-পা' বা অরগ্যান থেকে ফেরা মানুষ রূপে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। ইংরাজ আমলে আমাদের দেশের প্রথম 'বিলাত ফেরতদের' মতো খ্যাতি ও মান সম্মানের অধিকাবী হয়ে উঠলেন। তার আসল নামটি কী ছিল তা এই নতুন খেতাবের দাপটে সকলের স্মৃতি থেকে মুছে গেলো।

কিন্তু বেশি দিন তিনি চুপচাপ থাকতে পারলেন না। আবার একদিন ভারতমুখো হলেন। এলেন বুদ্ধগয়ায়। এখানকার রাজা রামপাল তাকে বিশেষ মানসম্মান দেখান, আদর-অভ্যর্থনা করেন। 'গুহ্য সমাজের শ্রেষ্ঠ রত্ন' উপাধি দেন।

রাজা রামপাল বোধ হয় বুদ্ধগয়া অঞ্চলের কোন সামন্ত রাজা ছিলেন।

ভারত থেকে ফিরে যাবার পর তিনি চীনের রাজা 'গো-পা-ল'-এর আমন্ত্রণে চীনে যান। পথে তিব্বতের প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক কর্মপা-র সঙ্গে তার দেখা হয়। তিনি তার মতধারা প্রচারের ভার অরগ্যান-পা'র উপর দেন।

•• চীনে গিয়ে এক বছরের মধ্যেই ফিরে আসেন অরগ্যান-পা'।

এই সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জীর লেখক বিশিষ্ট সংকলক পদ-ম-ধ্‌কর পো-এর ভাষায় 'তিনি চীন থেকে, সত্যি কথা বলতে কি, একটি সূঁচও পাননি।

চীনের রাজা 'গো-পা-ল' নিঃসন্দেহে 'কুবলাই খান'।

প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক কর্মপা-র জন্ম ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি।

এসব থেকে অরগ্যান পা'র উড্যান তীর্থকাল মোটামুটি ভাবে ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধার্য করা যেতে পারে।

৭০ বছর বয়সে অরগ্যান-পা'র মৃত্যু হয়।

সিদ্ধ রগদ তসঙ পা'

এই কাহিনীটিই আগে শোনানো উচিত ছিল। কেন না, কালের নিরিখে এ কাহিনীর নায়ক সিদ্ধ রগদ তসঙ পা' অরগ্যান-পা' থেকে প্রাচীন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন অরগ্যান-পা'রই গুরু। অতএব, স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারি যে, তার শিষ্য অরগ্যান-পা' এ দেশে আসার বোধ হয় কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর আগে তিনি এখানে এসেছিলেন।

শিষ্য অরগ্যান-পা' যে কজ্জল বা খজলকের কাশ্মীর জয়ের (খ্রীঃ ১২৫৯ অব্দ) আগেই ভারতে তীর্থ করতে এসেছিলেন তা আমরা জেনেছি। এই সুবাদে তার ভ্রমণকাল মোটামুটি ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলে মনে ক'রে নেয়া যেতে পারে। গুরু রগদ তসঙ পা'র তীর্থকাল তাই কম বেশি ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

গুরু-শিষ্য দু'জনেই যে সময় এদেশে আসেন তখন ভারত তার ইতিহাসের চরমতম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে চলেছে। মানব ইতিহাসের এক বর্বরতম অধ্যায়ের শিকার হয়ে তার আগুনের উত্তাপে সে তখন ঝলসে চলেছে। যে ধর্মের প্রকৃত অভিমুখ্য হলো মানুষের আত্মিক উন্নতি ও শুভ বোধ বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ এক সুসভ্য নির্মল বিশ্ব-মানবসমাজ গড়ে তোলা, সেই ধর্মের নামে মানুষ বর্বরতার কতো অতল সোপানে নেমে যেতে পারে, ঝলসে-পুড়ে চলা ভারত তখন অসহায় ভাবে তা অনুভব ক'রে চলেছে। মহানহৃদয় মূল ধর্মপ্রবক্তারা যে স্বপ্ন ও আকাঙ্খা নিয়ে মানুষের মধ্যে ধর্মের বীজ ছড়াতে চেয়েছেন তা অবশ্য কোন কালেই কোন দেশ কোন সমাজে বাস্তব রূপ নেয়নি। তাদের মৃত্যুর পর তাদের অনুগামীরা সর্বত্রই আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সম্প্রদায়

গড়তে, যেন তেন প্রকারে দল ভারী করতেই ব্যস্ত থেকেছে। মানব-জাতির সংহতির নামে তাকে আরো বেশি ক'রে ক্ষুদ্র ও খণ্ড ক'রে তুলেছে। কেউই মুক্ত চিন্তাধারা নিয়ে প্রকৃত কল্যাণ পথের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। কুসংস্কার ও যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সমাজ ব্যবস্থার নাগপাশে জড়িয়ে তার স্বাভাবিক অগ্র-গতির পথও আটকে দিয়েছে। এই বিংশ শতকে সার্বিক মুক্ত চেতনার পরিবেশ মধ্যেও সে নাগপাশ কেটে অনেকেই বেরিয়ে আসতে পারেননি। তবে, যেন তেন প্রকারে দলভারী করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জোর ক'রে ধর্মান্তরের নীতি এক কথায় অনন্য, উপমাহীন।

ভারতীয় জনজীবনে এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের শুরু ৯৯৮ অব্দে সুলতান মাহমুদের ঘজনা বা গজনীর সিংহাসন অধিকারের পর থেকে। ভারতে মুসলমানদের হানা অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই শুরু হয়। তবে সে হানা ভারতের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত করলেও তার হাড়ে কাঁপন জাগাতে পারেনি।

মাহমুদের পিতা সবুক্তগীন কাবুল অধিকার ক'রে ঘজনার সিংহাসনে বসার পর ভারত সীমান্ত দুর্বল ক'রে তোলার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। সীমান্ত জুড়ে তিনি অনেক রাস্তা-ঘাট তৈরী করেন। সুলতান মাহমুদের সমকালীন অল-বেরুণীর ভাষায় "আর, ওই সব পথ দিয়ে পরে তার ছেলে যমীন-অদ্দৌলা মাহমুদ ৩০ বছরেরও বেশিকাল ভারত-অভিযান ক'রে চলেন। মাহমুদ দেশটির সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ধ্বংস করেন, অস্বাভাবিক পীড়ন ও লুণ্ঠন চালান। ফলে হিন্দুরা ধুলোর অণুর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। পুরা-কাহিনীর মতো এসব ঘটনার কথা লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।" লুণ্ঠন ও অত্যাচার-ই শুধু নয়। জোর করে ধর্মান্তর ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস, লুণ্ঠন ও দেবমূর্তি ভাঙা বা তুলে নিয়ে গিয়ে মসজিদের প্রবেশ দ্বারের কাছে পা দিয়ে মাড়াবার জন্য রেখে দেয়া—এ সবও সেই সাথে

চলে। এ ছাড়া বন্দী স্ত্রী-পুরুষদের দাসে পরিণত করা তো ছিলই।

মাহমুদ কম করেও ১২বার ভারতে প্রবেশ করেন। তার নজর ভারতের মাটির চেয়ে ধনদৌলতের উপরই বেশি ছিল। তাই থানেশ্বর পর্যন্ত অধিকার করেই তিনি খুশী ছিলেন।

এরপর তুর্কী মুসলমানেরা ভারতের উত্তরাপথেব পশ্চিম প্রান্ত থেকে একেবারে পূবপ্রান্তে বাঙলা পর্যন্ত অগ্রসর হন। ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী তুর্কী বা তাতার মুসলমানদের অধিকারে আসে। ক্রমে সেখানে ইলতুতমিশের দ্বারা সুলতান বংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ শতকে বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু অংশ ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিলে সমগ্র উত্তরাপথই মুসলমানদের অধীনে চলে যায়। চতুর্দশ শতকেব আরম্ভে দক্ষিণাপথেও তারা ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভারতবর্ষ যেন তখন তাদের কাছে 'নো ম্যানস ল্যাণ্ড'। কিছু দলবল নিয়ে সাহস ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছু অঞ্চল দখল ক'রে নিয়ে রাজা ব'নে যেতে পারলেই হলো। তার পর চালাও লুণ্ঠন আর অত্যাচার। এর জীবন্ত বিবরণ ইবন বাতুতা তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্যে দিয়ে গেছেন।

এই সব রাজা-রাজড়া সুলতানেরা কাগজে-কলমে মুসলমান ছিলেন সত্য। মুসলমান ধর্ম বিস্তারের উৎসবে মেতে ধর্মীয় সমর্থনও কুড়িয়েছেন প্রচুর। কিন্তু মানবিক সভ্যতা ও কৃষ্টির মানদণ্ডের বিচার থেকে এরা মানুষ ছিলেন কিনা এ বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। এরা সিংহাসনের জন্য বাপ-ভাই আত্মীয়-পরিজন কাউকে হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করেননি। কোন হীন কাজ করতেই আটকায় নি। আজ যিনি সুলতান আছেন কাল ভোরেও তিনি সুলতান থাকবেন কিনা সে বিষয়ে তিনি নিজেও নিশ্চিত ছিলেন না। হত্যার উৎসবের মধ্য দিয়েই তিনি সিংহাসনে বসেছেন ও ওই ভাবেই ভাই, ছেলে, ভাইপো, জামাই কি আমীর ওমরাহের হাতে শেষ হয়েছেন।

সমাজের উঁচু স্তরে যখন এই চিত্র তখন নিচু স্তরে কী অবস্থা

বিরাজ করছিল তা জানা ও বোঝার জন্য ইতিহাস পড়ার প্রয়োজন হয় না।

র‍্গদ তসঙ পা' যে সময়ে ভারতে আসেন তখন দিল্লীতে প্রথম সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইলতুতমিশের (১২১১-১২৩৬) রাজত্ব চলছিল বলে ধরে নিতে পারি। অরগ্যান-পা'ও এই বংশের রাজত্ব-কাল মধ্যেই এ দেশে আসেন।

ভারতে যখন অপ্রতিহত গতিতে মুসলমানদের জোয়ার ও ধর্মীয় উন্মাদনা চলেছে,তখন এই দুই তিব্বতী বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীর ভারত ভ্রমণ নিশ্চয়ই দুঃসাহসিক বলতে হবে। র‍্গদ তসঙ পা' অবশ্য জালন্ধর পর্যন্ত এসে তারপর ফিরে যান। কিন্তু অরগ্যান-পা' উড্যান পর্যন্ত এসেছিলেন। এমন কি তারপর আবার তিনি মগধেও বোধিবৃক্ষ দর্শনের জন্য আসেন।

শুধু তাই নয়, অরগ্যান-পা'র ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে খবর পাওয়া যায় যে, সিন্ধু নদের তীরে তখনও ভারতীয় রাজাদের রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। স্বাত বা সুবাস্তু নদীর উপত্যকা অঞ্চল উড্যান রাজ্য তখনো ভারতীয় শাসনকর্তার অধীন। সব থেকে আশ্চর্য কথা, তখনো সেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং দেব মন্দিরাদির অস্তিত্ব রয়েছে।

অবশ্য শুধু অরগ্যান-পা'-ই নয়, মার্কো পোলোও এই একই সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তিনিও বলেছেন, উড্যানের অধিবাসীরা সকলেই প্রতিমা-পূজক। মায়াবিদ্যা ও তন্ত্র মন্ত্রের প্রয়োগের দিকে তাদের দারুণ ঝোঁক রয়েছে। মার্কো অরগ্যান-পা' থেকে সামান্য কিছুটা পরবর্তী ছিলেন। ১২৭৫ থেকে ১২৯০-এর মধ্যে কোন সময়ে তিনি সেখানে গিয়ে থাকবেন।

শিষ্য গুরুকে ডিঙিয়ে বেশিদূর ভ্রমণ করলেও, গুরুই ছিলেন প্রথম পথপ্রদর্শক। সেদিক থেকে সিদ্ধ র‍্গদ তসঙ পা'-র ভ্রমণ ইতিহাসের দিক থেকে নিশ্চয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সিদ্ধ র‍্গদ তসঙ পা'র ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ অবশ্য পাওয়া যায়

না। তিব্বতী পুঁথিপত্তর ঘেঁটে তুচ্চি যতোটুকু আমাদের জানিয়েছেন সেইটুকুই আমাদের সম্বল।

কাহিনীর আরম্ভে দেখা যায় সিদ্ধ র্‌গদ তসঙ পা' তিব্বতের জুঙ-জুঙ রাজ্য থেকে খাড়াই পাহাড়ী পথ ভেঙে পবিত্র ভূমি তীর্থপুরীর দিকে এগিয়ে চলেছেন।

তীর্থপুরী কৈলাস পর্বত ও মান সরোবরের পশ্চিম দিকে, শতদ্রু নদীর দক্ষিণ কূলে।

'বজ্রকায়ের (২৪টি) অঙ্গ বা পীঠস্থানের মধ্যে এটি একটি। তিনটি উপত্যকা এখানে এসে মিশেছে। একটি উঁচু পর্বত থেকে জন্ম নিয়ে গঙ্গা নদী এখান থেকে নিচে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।'

যে নদীটিকে এখানে গঙ্গা বলা হয়েছে, সেটি কিন্তু আসলে গঙ্গা নয়, শতদ্রু। আর, উঁচু পর্বতটি হলো কৈলাস। কৈলাসের মান সরোবর থেকে জন্ম নিয়ে শতদ্রু নদী তীর্থপুরীর পাশ দিয়ে হিমাচল ও পাঞ্জাব প্রদেশ পার হয়ে সিন্ধু নদে এসে মিশেছে।

তীর্থপুরীকে যে তিনটি উপত্যকার সঙ্গমস্থল বলা হয়েছে তার একটি হলো শতদ্রু নদীর উপত্যকা, আরেকটি মিশর নদীর উপত্যকা ও অন্যটি, তীর্থপুরীর দক্ষিণে যে নদীটি এসে শতদ্রুর সঙ্গে মিশেছে তারই উপত্যকা।

'এর তীরে মহেশ্বরের তিনটি পবিত্র আবাস (মন্দির বা তীর্থস্থান) রয়েছে।'

তীর্থপুরীতে পৌঁছে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তসঙ পা' দিনকয়েক সেখানে কাটালেন। 'এসব তীর্থে এলে স্বভাবতঃই লোকের অশেষ পুণ্য ও কল্যাণ হয়।' তসঙ পা'ও অনুভব করলেন তার আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও শুভ প্রবণতা অনেক জোরদার হয়েছে।

তারপর ফিরে গেলেন আবার সেই জুঙ-জুঙ। সেখানকার গুগে প্রদেশের মঙনঙ-এ হাজির হলেন। '(শ্রীজ্ঞান) অতীশ এখানে থাকতেন।' একটি অলৌকিক ঝরনাও দেখলেন তিনি এখানে।

চলে গেলেন এবার আরো নিচের দিকে। এলেন 'মৃতো লিডঙ' মন্দিরে। মন্দির দর্শনের পর ঘুরে ঘুরে 'লহ্ বত সান' 'বয়ন কু'ব 'ওদ' প্রভৃতি সিদ্ধের বাসস্থান দেখলেন। পথ চলতে চলতে এক সময়ে একটি নদীর কূলে এসে পড়লেন। নদীটি বেশ বড়ো। নদীর চেহারা দেখে তিনি দমলেন না। সেটি পার হলেন। কোন বিপদ ঘটলো না।

পুরো জঙ-জুঙ রাজ্য পার হয়ে এরপর তিনি ভারতের হিমাচল প্রদেশের 'লাহুল'-এর কাছে স্পিটি এলেন। এখানে বিল কগস্ বা পিলচে পাহাড়ের উপরে মহাসিদ্ধ ক রাগ পা'-র বাস। র্দসোগস চেন যানের কেউ সাধনায় তার জুড়ি ছিলনা। এক আসনে তিরিশ বছর ধরে সাধনা ক'রে চলেছেন।

তসঙ পা' তার সঙ্গে দেখা করলেন। তার কাছে ধর্ম শিক্ষা করার বাসনা জানালেন। তিনি সেজন্য দক্ষিণা চেয়ে বসলেন।

আমি ভিখারী, দক্ষিণা দেবার মতো অর্থ কোথায় পাবো ? উত্তর দিলেন তসঙ পা'।

তিনি সে কথা শুনে বললেন : তবে কী আর করা যাবে। ফিরে যাও।

তসঙ পা' তখন মনে মনে তাকে সপ্ত বস্তু দিয়ে পূজা-অর্ঘ নিবেদন করলেন।

মহাসিদ্ধ তখন বেজায় খুশী। বললেন, সেরা দক্ষিণা পেয়ে গেছেন তিনি। আর কোন বাধা নেই শেখাতে।

তসঙ পা'কে পঞ্চ সাধনা বিষয়ে তিনি উপদেশ নির্দেশাদি দিলেন।

পঞ্চ সাধনা বলতে পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধের সাধনাপদ্ধতি। বৌদ্ধ বজ্রযান তন্ত্রসাধনাধারার অঙ্গ এটি। পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধ হলেন (১) অমিতাভ (২) অক্ষোভ্য (৩) বৈরোচন (৪) অমোঘ সিদ্ধি (৫) রত্নসম্ভব।

শিক্ষা শেষ ক'রে আবার তিনি পথে নেমে পড়লেন। এগিয়ে

যেতে যেতে একটি ছোট্ট সংঘারামে এসে হাজির হলেন। দেখা পেলেন এক নগ্ন সাধকের। তিনি অবিরাম 'হুম' মন্ত্র জপে চলেছেন। এই মন্ত্র জপে জপেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। বুঝতে পেরেছেন, সব কল্পনাই স্ব-বিরোধী।

আরো এগিয়ে যেতে অপর একজন মহাসিদ্ধের দর্শন পাবার সৌভাগ্য হলো। এর নাম 'সন্তোষ-গরিমার দেশ থেকে আসা মানুষ'। ইনি মৌনী হয়ে সব সময়ে ধ্যান ক'রে চলেছেন। কারো সঙ্গে কথা বলেন না।

তসঙ পা' আরো এগিয়ে চলেছেন। চলতে চলতে 'গর-শ' বা লাহুল এসে পৌঁছলেন। এখানে গন্ধল বা গুরু ঘণ্টাল পর্বত। পর্বতটি এক মাইল উঁচু। তার চূড়ায় ধর্ম-মু-ত্রি বা ধর্মমূর্তি স্তূপ। পর্বত-শিখরে উঠে স্তূপটি দর্শন করলেন।

'পর্বতটির চারিদিকে অলৌকিক নদী আর গাছপালা। অঞ্চলটি সব দেবতা ও ডাকিনীদের আশীর্বাদে ধন্য। সিদ্ধ যোগী ও যোগিনী-দের আবাস। সব অঞ্চলের সেরা।'

লোকবসতি থেকে একটুখানি এগিয়ে গেলেই একটি ছোট বিহার। তবে সেখানে থামলেন না তিনি। চলে এলেন মগর (হগর)-এর লোটসাব-এর কাছে। কথায় কথায় জালন্ধর যাবার প্রস্তাব তুললেন। শুনে লোটসাব তো প্রথমে আঁৎকে উঠলেন।

উহুঁ! ওখানে গেলে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না। নির্ঘাৎ মারা পড়বো আমি।

অনেক দোনোমোনো ক'রে শেষ অবধি অবশ্য যেতে রাজী হলেন।

পথে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য কাম্ব বা ছাম্ব-এর মন্ত্রীর কাছে একজন দোভাষীকে পাঠালেন।

দোভাষী মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে এই দুই সাধুর জালন্ধর যাবার পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন। তাকে এই দুই বড়ো সাধুর সঙ্গী হবার প্রস্তাব দিলেন।

মন্ত্রীর নাম স্থ-লু। তিনি সব কথা শুনে বললেন, যাবার জন্য রাজার আদেশ এলে তখন পরামর্শ করে খবর দেবেন।

সব ব্যবস্থা হবার পর শুভদিন দেখে গর-শা ছেড়ে তারা দুজনে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে আরো কিছু যাত্রী। এদের বেশির ভাগই বণিক।

উঁচু নিচু পাহাড়ী রাস্তা। ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে চলেছেন তারা। চলতে চলতে এক উত্তুঙ্গ গিরিপথের পাদদেশে এসে থামলেন। চারিদিকে আয়নার মতো ঝিকিমিকি তুষার। পাহাড়টির দিকে তাকালে ভয় হয়। এতো উঁচু, তসঙ পা'র মনে হলো, বুঝি বা এ পাহাড় স্বর্গ ফুঁড়ে মাথা তুলেছে।

বোধহয় দুই তীর্থযাত্রী দ্রতি গিরিপথের নিচে এসে পৌঁছেছেন। সাগর রেখা থেকে এ গিরিপথটি ১৫,৯৩১ ফুট উঁচুতে। বর্তমান কালে প্রায়ই পাথর ধ্বস নামার দরুন এপথ আরো দুর্গম ও বিপদ সঙ্কুল হয়ে উঠেছে।

কী ক'রে এ পথ পার হবেন তাই ভেবে ভেবে তারা সারা হচ্ছেন। এমন সময় একদল তল্পীবাহক মোন পা' সেখানে এসে হাজির হলো।

পার্বত্য উপজাতির যে সব লোকেরা ভারত সীমান্তে বসবাস করে তিব্বতীরা তাদের মোন পা' বলে। আবার যে সব অঞ্চল তিব্বতীরা পরে নিজেদের দখলে এনেছে, সে সব অঞ্চলের আদিবাসীদেরও এ নামে ডাকে।

মোন পা'দের দেখে তাদের মনে আশার সঞ্চার হলো। ভাবলেন ওরা যদি পার হতে পারে, আমরাও পারবো।

গাঁইতি দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে পা ফেলার খাঁজ ক'রে নিয়ে মোন পা'রা এগিয়ে চলতে থাকলো। পিছু পিছু তারাও চলতে থাকলেন সেই পথ ধরে। দুপুর নাগাদ সবাই এসে উপস্থিত হলেন গিরিপথের শীর্ষে।

এবার নামার পালা। উৎরাই চড়াইয়ের চেয়েও খাড়া। দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন দুই তীর্থযাত্রী। উপরে না হয় খাঁজ কেটে ওঠা গেছে। কিন্তু নিচে নামবেন কী করে?

দু'জনকে অবাক ক'রে দিয়ে একজন মোন পা' কোমরে দড়ি বেঁধে ঢালের দিকে নেমে পাহাড়ের গায়ে তার গাঁইতি দিয়ে কতক খাঁজ কেটে ফেললো। তখন বাকী সবাই ধীরে ধীরে তার পিছু নিলো। এইভাবে সারাদিন মোন পা'রা পালা ক'রে পথ তৈরী ক'রে চললো। আর বাকী সবাই সেই পথ অনুসরণ ক'রে এগিয়ে যেতে থাকলো। তাদের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থযাত্রীরাও।

গিরিপথ পার হয়ে যখন অপর কিনারায় সকলে পৌঁছালো, তখন গোধূলি বেলা।

এরপর আরো প্রায় ১২ দিন পথ চলার পর লোটসাব ও র‍্গদ তসঙ পা' ছাম্বের রাজনগরীতে এসে পৌঁছলেন।

'মন দেশের সবগুলো পাহাড় এখানে এসে শেষ হয়েছে। এবার ভারতের সমতল ভূমি। এ ভূমি যেন হাতের পাতার মতো সমান। ফসল, খাবারদাবার, হরিণাদি পশু পাখি সব কিছুই অসম্ভব রকমের ভালো। আখের সবুজ বনে বাতাসের দোলায় জেগে ওঠা ঢেউয়ের তরঙ্গ এক মধুর আবেশ জাগিয়ে মনকে পুলকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে।'

'ছাম্ব-এর রাজার নাম বি-ৎজি-ক্র-ম (বিচিত্রবর্মা ?)। তার অধীনে ৭০০০ কর্মাধীশ রয়েছে। এদের প্রত্যেকের অধীনে সাত হাজার ক'রে সৈন্য।

অমাত্য ও সৈন্যদের সংখ্যা বর্ণনায় অবশ্যই বাড়াবাড়ি রয়েছে। তবে পরবর্তী লিপিপ্রমাদ ফলেই এমনটি হয়েছে বলে মনে হয়।

প্রাকার ঘেরা রাজনগরীর ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকে লোটসাব ডমরুধ্বনি তুললেন।

শহরের অধিবাসীরা, রাজপ্রাসাদের বাসিন্দারা সবাই কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে এলো।

রাজা নিজে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে একটি বারান্দায় এসে বসলেন। দুই তীর্থযাত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। তারা কী ভাবে এতো দুর্গম পথ পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছলেন, সে কাহিনী শুনে বিহ্বল হয়ে গেলেন। বার বার মনের বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকলেন।

রাজনগরীতে দিন পাঁচ-ছয় তারা রয়ে গেলেন। বেশ সুখেই কাটলো। তারপর রওনা হলেন জালন্ধর।

তিন দিন টানা পথ চলার পর পৌঁছলেন সেখানে। শহরে ঢুকে পড়লেন। দু'জনকে দেখে ছোটখাটো এক ভিড় জমে গেলো। জনতার মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে দু'জনকে সম্মান দেখিয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। ভালো খাবার আয়োজন ক'রে, অনেক আদর যত্ন ক'রে খাওয়ালেন।

জালন্ধর বজ্রকায়ের ২৪টি পীঠের মধ্যে একটি।

'জম্বুদ্বীপে এরকম ২৪টি পীঠস্থান রয়েছে। পরিবর্তন যোগ্য ২৪ রকম মানুষের ধর্ম-ধারণা পরিবর্তনের জন্য এই স্থানগুলিতে 'হেরুক'-এর পুণ্য-আবির্ভাব ঘটেছিল। এগুলি হলো বর্হিলোকে দৃশ্যমান পীঠ। অন্তর্লোকস্থিত পীঠ হলো—নিজের দেহের ২৪টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

দেবতা হেরুককে বৌদ্ধ তন্ত্র মধ্যে পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম 'অক্ষোভ্য'-র অংশ বলে মনে করা হয়। ইনি হেরুক তন্ত্রের আরাধ্য দেবতা। যখন তাকে এককভাবে পূজা করা হয় তখন তিনি হেরুক। যখন 'অ্যাব-য়ুম' অর্থাৎ পিতা মাতা বা পুরুষ ও প্রকৃতির একজন রূপে পূজা করা হয় তখন তিনি 'হেবজ্র'। তিব্বতে তার 'হেবজ্র' রূপই জনপ্রিয়।

'সকল বীর ও ডাকিনীরা জালন্ধরে মেঘের মতো এসে জমা হয়। এ দেশটি হাতের তালুর মতো সমতল ও সহজগম্য। বোধিগাছ বা অশ্বত্থ গাছ, তাল গাছ ও রকমারী জাতের পাইন গাছ এখানে জন্মায়। হরীতকী, আমলকী ও বয়রার মতো অনেক ভেষজ গাছও এখানে রয়েছে।'

'খুবানী, নাশপাতি, আপেল, পীচ, আখরোট জাতীয় নানারকম ফলের গাছ চোখে পড়বে। আছে পদ্ম, কুমুদ, পুণ্ডরীক ইত্যাদি সব রকমের পদ্ম এবং রকমারী ফুলের গাছ। ময়ূর, তোতা, সারস প্রভৃতি নানারকম পাখির কাকলিতে দেশটি মুখর। কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ, বাঘ, নেকড়ে ইত্যাদি শিকার করার মতো জন্তু জানোয়ারও প্রচুর।'

'দেশটি দেব দেবীদের স্বাভাবিক বাসস্থান।'

'ডাইনে বাঁয়ে দুটি বড়ো নদী। নাগ-কো-এ বা নগরকোট শহরে একটি পাহাড়মালার বাঁকের কাছে নদী দুটি এসে মিশেছে। পাহাড়টিকে দেখলে মনে হবে যেন একটি হাতী শুয়ে আছে। শহরটির জনসংখ্যা পাঁচ হাজার।'

'এই পাহাড়-শাখায় জ্বালামুখী নামে একটি বড়ো মন্দির আছে। বৌদ্ধ, অ-বৌদ্ধ (অর্থাৎ বৌদ্ধ ও হিন্দু) উভয়েই এখানে পূজা দেয়। মন্দিরটির অধীনে তিরিশটি গ্রাম রয়েছে।'

ঋগদ তসঙ পা' ও লোটসাব দুই সাধু মিলে মন্দির দর্শন করতে গেলেন। তখন সন্ধ্যা আরতির সময়। দেখেন, মন্দিরে প্রায় ষাট-সত্তরটি মেয়ে সমবেত হয়েছে। সকলেই কুমারী। দেখতে বেশ সুন্দরী ও মনোহারিণী। প্রত্যেকটি মেয়েই পাঁচ দৈব-সুলক্ষণ যুক্তা। রত্নখচিত মুকুট, নানা অলংকার ও সাজ পোষাকে মন মাতিয়ে তোলার মতো ক'রে সেজেছে সবাই। কতক মেয়ের হাতে রয়েছে ফুল, ধূপ-ধূনা প্রভৃতি পূজার সামগ্রী। সূতী কাপড়ের ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে তারা মন্দিরের ভিতরে ঢুকলো।

সিদ্ধ তসঙ পা'ও তাদের পিছু পিছু গেলেন। একজন নিচু শ্রেণীর লোক কপাট আগলে বসেছিল। সে তাকে যেতে বাধা দিলো। তসঙ পা' সে বাধা মানলেন না। সোজা ভিতরে পা বাড়ালেন। লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে উগ্রভাবে বাধা দিতে গেলো। কিন্তু ততক্ষণে তসঙ পা' মন্দিরের মধ্যে।

মেয়েদের মধ্যে নেত্রী গোছের একজন তসঙ পা'কে ডেকে বসতে দিলো।

তসঙ পা' তার কাছে মেয়েদের পরিচয় জানতে চাইলেন।

মেয়েটি উত্তর দিলো : এরা সবাই ডাকিনী।

এখানে তসঙ পা'র বিবরণে বোধহয় কিছুটা ভুল রয়েছে। পরের বিবরণ থেকে এই মেয়েদের কিন্তু দেবদাসী বলেই মনে হয়। সেকালেব প্রায় সব বড়ো বড়ো হিন্দু মন্দিরেই এই প্রথা ছিল।

যে মেয়েটি তসঙ পা'র সাথে কথা বলছিল, সে এবার গান গাইতে আরম্ভ করলো। অন্য মেয়েরাও তার সঙ্গে যোগ দিলো।

তসঙ পা'র মনে হলো : যেন এরা ষোড়শ মহাবিদ্যা বা বিংশতি দেবী।

ধূপ-ধুনা, ফুল ইত্যাদি নিয়ে আসা পূজার সামগ্রী দিয়ে তারা বিগ্রহকে পূজা নিবেদন ক'রে চললো। গানের সাথে সাথে হাত নেড়ে নাচতে থাকলো।

'এই বড়ো শহরটির মাথায়, নিচের দিকে পাঁচটি শ্মশান আছে। প্রথমটির নাম ক-ম-কু-লদন-সর। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যরা এখানে শব নিয়ে আসেন। এরপর প-গ-সু শ্মশানটি। এটি সমতল ভূমির উপর একটি ছোট পাহাড়। পাহাড়টির উপরে বিধর্মীদের একটি মন্দির রয়েছে। এটি সম্বর-এর আবাস।'

বৌদ্ধ দেবতা সম্বর 'হেবজ্র'-রই অন্য এক স্বরূপ।

'তৃতীয়টি হলো ত্রিকোণাকৃতি ল-গু-র মহাশ্মশান। অলি ও কলির প্রতীকসহ এখানে রবি ও চন্দ্রের মন্দির রয়েছে। এ দু'য়ের মধ্যে একটি বেদীর উপর ভট্টারিকা যোগিনীর স্বপ্রকটিত মূর্তি রয়েছে।'

এই শ্মশানটিকেই এখানকার সব থেকে নামকরা শ্মশান বলে মনে হয়। তসঙ পা'র পর অরগ্যান-পা' ও তার বহু পরে রস পা'ও এর উল্লেখ ক'রে গেছেন।

অলি-র অর্থ স্বরবর্ণ, কলি-র অর্থ ব্যঞ্জনবর্ণ। প্রত্যেক মন্ত্রই

এ দুইয়ের সমাহারে রচিত। তাই একে বিশ্ব-সৃজনের প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে তন্ত্র মধ্যে। তান্ত্রিক কল্পনা অনুসারে অলি ও কলি চন্দ্র ও সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়ে চলেছে। তার মানে নাভি পদ্মের গূঢ় বৃত্তকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তন ক'রে চলেছে।

ভট্টারিকা যোগিনী বা আর্য ভট্টারিকা সুষুম্না নাড়ীর তুরীয় অবস্থার প্রতীক।

'মি-বক্র-স-রো নামের মহাশ্মশানটি হলো চতুর্থ। এখানে বাস করলে প্রচুর দৈবানুগ্রহ লাভ হয় ও নানা শুভলক্ষণের অধিকারী হওয়া যায়।'

'এরপর শি-তি-স-র শ্মশান। এটিতে পালা ক'রে বীর ও ডাকিনীরা জমায়েত হয়ে থাকেন।'

'যদি কেউ এসব শ্মশানে বাস করে, তার পুণ্যের সঞ্চয় প্রচুর বেড়ে যায়, গভীর শুভ-প্রবণতা দেখা দেয়। বিশেষ করে ল-গু-র ও প-গ-সু শ্মশানে বাস করলে।'

'এ শহরে অনেক সাধু সন্ন্যাসী ভিক্ষে করে বেড়ান। এদের মধ্যে বৌদ্ধ অ-বৌদ্ধ যোগী ব্রাহ্মণ সব রকমই রয়েছে।'

'ভিক্ষে করা বা দেবার সময় সাধারণতঃ এই রকম।'

'বাড়ির গিন্নি রোদ বেড়ে ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়েন। সারা বাড়ি ঝাড়ু দিয়ে ভালো ভাবে সাফ ক'রে গরুদের বাঁধন খুলে দিয়ে ঘর বারান্দা পরিষ্কার করেন। তাদের ঘরগুলো বিহারগুলির চেয়েও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের মাটির দেয়ালে নানারকম চিত্র আঁকা।'

'রান্না ঘরের একপাশে তারা ভাত-টাত যা কিছু রান্না করে। তারপর তিল তেলের প্রদীপ জ্বালায়, সুগন্ধি ধূপ-ধুনা পোড়ায়। একটি কাঁসার বাসনে ভাত ঢেলে রেখে বাইরের কাজে মন দেয়। পরিবারের সকলের স্নান শেষ হলে গিন্নি প্রথমে চন্দ্র ও সূর্যকে পূজা করেন। তারপর মহাদেবের পূজা করেন। এরপর গৃহাঙ্গন ও

বহিরাঙ্গন দেবতাদের পূজা দেয়া হয়। পূজা শেষ হলে গিন্নি ঘরের ভিতরে আসেন। ভাত ঠাণ্ডা হলে সব রকম অপরিচ্ছন্নতা এড়িয়ে সপরিবারে খেতে বসেন। এ সময় নানারকম মশলার সৌগন্ধে চারিদিক ভরপুর হয়ে ওঠে। তখন সব ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করতে যায়।'

'যোগীরা গৃহস্থের দরজায় দাঁড়িয়ে পিতলের ঘণ্টায় তিনবার শব্দ তোলে। তাদের এক হাতে থাকে লাউয়ের খোলসের পাত্র, অন্য হাতে ডমরু। নানাভাবে ডমরু ধ্বনি তুলে বলে—ভিক্ষা দিয়ে ধর্ম করো।'

"জালন্ধর দেশটি বেশ বড়ো। এখানে অসংখ্য শহর। 'না-গ-কো-টে-র তিব্বতী মানে হলো—'নাগের দুর্গ'।"

প্রায় পাঁচ মাসের মতো র্গদ তসঙ পা' জালন্ধরে কাটালেন। তবে এজন্য বেশ কষ্ট পেতে হলো তাকে। কপালে ভালো আদর আপ্যায়ন জুটলো না। জোটেনি সবদিন পেটপুরে খাবার মতো খাদ্য। পুষ্টির অভাবে দিন দিন তার শরীর ভেঙে পড়তে থাকলো। ভয়ানক কাহিল হয়ে পড়লেন তিনি। তখন ঠিক করলেন, আর নয়, এবার দেশে ফিরে যাবেন।

মনে ছিল পুণ্যতীর্থ কুলুত (কুলু উপত্যকা) দেখার বাসনা। •াই এবার আগেকার ঘুরপথে না গিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ধরলেন।

দুদিন পথ চলার পর এলেন কি-রি-রম নামের একটি স্থানে। একজন বড়ো সাধুর সাথে এখানে তার দেখা হলো। নাম তার অনুপম। তসঙ পা' তার কাছে ধর্ম-ব্যাখ্যান শুনতে চাইলেন।

তিনি বললেন : বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অনুগত থাকো।

এভাবে ত্রি-রত্নকে রক্ষা করে চলার প্রেরণা দিয়ে তিনি তাকে বললেন : 'আমরা দুজনে দুই বজ্রভাই (অর্থাৎ বজ্রযানের অনুগামী) আচার্য নাগার্জুনের শিষ্য। তুমি তিব্বত ফিরে যাও। সেখানে লোকের মহৎ উপকার হবে তোমাকে দিয়ে।'

সাধু অনুপমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কুলুত রওনা হলেন।

'বজ্রকায়ের ২৪টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা পীঠের মধ্যে একটি হলো কুলুত। এটি তার হাঁটু। এর হৃদিবিন্দুকে সিদ্ধি বলা হয়। সেখানে শ্বেত পদ্মের একটি বন আছে। একটি পাথরের উপর বুদ্ধের চরণ চিহ্ন আঁকা রয়েছে। এখানে বাস করলে একজন লোক দ্রুত (প্রজ্ঞা পারমিতা স্তরের) সাধারণ জ্ঞানের চূড়ান্ত সোপানে পৌঁছে যায়। তবে, নানা রকম প্রতিবন্ধকতারও মুখোমুখি হতে হয় তাকে। এখানে দু'জন পূজনীয় ভদন্ত থাকেন। একজন যোগীও আছেন।'

কুলুতকে পিছনে ফেলে এবার তিনি পশ্চিম ঘেঁষা উত্তরমুখী এগিয়ে চললেন। এলেন গর-শ বা লাহুলে। গরমের মাস কটি এখানে গ-ন্ধ-ল বা গুরু ঘণ্টাল-এ কাটিয়ে দিলেন। এখানে থাকার ফলে তার আধ্যাত্মিক শুভ-প্রবণতা খুব বেড়ে গেছে বলে অনুভব করলেন তিনি।

শরৎকাল দেখা দিতে গ-ন্ধ-ল বা লাহুল ছেড়ে স্পিটি এগিয়ে চললেন।

স্পিটি বর্তমান হিমাচল প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে।

চড়াই উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে এক সময়ে তিনি সেখানকার রট-সঙ সদ গিরিপথের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

গিরিপথ পার হয়ে ওপারে গেলেই তিব্বত।

স্তাগ তসঙ রস পা’

নাম তার স্তাগ তসঙ রস পা’। অন্য দুই তিব্বতী তীর্থযাত্রীর মতো তিনিও একজন তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তাদের মতো তার মনেও সংকল্প দেখা দিলো—ভারত যাবেন।

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল, চতুর্থ শতক বা তার আগে, এই ভারত থেকেই। তবে সে নামমাত্র! পরে সপ্তম শতক থেকে তার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে সুরু করে। এই সময় ভারতের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগের দ্বার খুলে যায়। আর এ সময়ে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মে উত্তরোত্তর তন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মেও তাই বিশেষভাবে তন্ত্রের প্রভাব পড়েছে।

অষ্টম শতকের শেষার্ধভাগে মহাগুরু পদ্মসম্ভব হিমালয় অঞ্চলের বরফের দেশগুলিতে ঘুরে বেড়ান ও সিদ্ধ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ঘঙ-চেন বা তিব্বতের স্থানীয় ধর্ম ‘বন’-এর প্রধান প্রবক্তাদের তিনি তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। পদ্মসম্ভব বিশিষ্ট তান্ত্রিকও ছিলেন। সুতরাং অলৌকিক ক্ষমতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েও তিনি সেখানকার মানুষদের প্রভাবিত করেন, বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তিব্বতে বৌদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠাও তারই কীর্তি। পদ্মসম্ভব নালন্দায় শিক্ষালাভ করলেও, তার জন্মস্থান স্বাত বা সুবাস্তু নদীর উপত্যকায় অবস্থিত উড্ডান। পদ্মসম্ভবের এই কার্যকলাপও তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের উপর তন্ত্রের প্রভাব বাড়িয়ে তুলেছিল। পূর্ব-ভারত অপেক্ষা বেশি করে উত্তর-ভারত ও উড্ডান-অভিমুখী করে তুলেছিল তিব্বতীয় বৌদ্ধদের।

যে অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা চমক সৃষ্টি করে পদ্মসম্ভব তিব্বতী-দের মন জয় করেছিলেন, ওই অলৌকিক ক্ষমতার মোহেই যে ভারতীয় বৌদ্ধরা দিন দিন তন্ত্রাভিমুখী হয়ে উঠেছিলেন এতে সন্দেহ

নেই। হয়তো এ কথাও ভেবেছিলেন যে, এই অলৌকিক ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারলে সহজে তারা ভারতীয় জন-সাধারণের মন জয় করে ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু ধর্মকে কাবু করে নিজেদের অপ্রতিহত প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। সপ্তম শতকে হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের সমর্থনে বৌদ্ধধর্মে নতুন প্রাণের জোয়ার সৃষ্টির প্রচেষ্টা কালে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম যে অলৌকিকত্বের মহামারীতে ভুগছিল, হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণের ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার বর্ণনা অনুসারে বৌদ্ধদের বিশেষ উৎসবের দিনগুলিতে বুদ্ধের দেহাস্থি ও রাজা অশোকের তৈরী প্রাচীন স্তূপগুলি থেকে অলৌকিক আলো বিচ্ছুরিত হতো। এই অলৌকিক আলো যে সেগুলির গা থেকে আপনা আপনি বার হতো না, লোক ঠকানো পদ্ধতিতে বার করা হতো তা বোধ হয় বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বোধিবৃক্ষের নিকটে থাকা মহাবোধি বিহারে বুদ্ধের দেহাস্থি থেকে এরূপ দিব্য আলোক বিচ্ছুরণের ঘটনা হিউয়েন-সাঙের নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তার জীবনী বইখানিতে দেয়া এই ঘটনার বিবরণই আভাস দেয়, এই দিব্য আলোক কী জাতীয় ছিল।

যাই হোক, তান্ত্রিক ক্ষমতার দ্বারা তিব্বতীদের মন জয় করা সহজ হলেও ভারতীয়দের মন জয় করা কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধদের পক্ষে সহজ হয়নি। কারণ, তন্ত্রের সাথে ভারতীয়রা বহু আগে থেকেই পরিচিত। এদেশে তন্ত্রের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মাহেন-জো-দরো সভ্যতার আমল থেকে এ দেশে তার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এর সঙ্গে সন্ধি করে একাত্ম হয়ে তবেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এদেশে টিঁকে থাকতে পেরেছে হিন্দু সংস্কৃতির রূপ নিয়ে। বৌদ্ধরা তন্ত্রের দিকে ঝুঁকে অসংখ্য দেব-দেবীর আমদানি করার ফলে সাধারণ মানুষের চোখে 'হিন্দু সংস্কৃতি' ও 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি'র প্রভেদ লোপ পেয়ে যায়। বৌদ্ধদের কার্যকলাপ সাধারণ মানুষকে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিলো যে, বৌদ্ধ সংস্কৃতির তুলনায় হিন্দু সংস্কৃতি প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ। ফলে

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে চললো। তারা বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি শাখা রূপে বিচার করতে শুরু করলো।

স্তাগ তসঙ রস পা' যখন ভারত আসার সংকল্প নিয়ে পা বাড়িয়েছেন, তখন বৌদ্ধ ধর্মের এই দৈন্যদশা চলেছে। এটি যে এককালে একটি পৃথক ধর্মমত ছিল, লোকে সে স্মৃতি প্রায় ভুলতে বসেছে। রাজনৈতিক পরিবেশও আগের তুলনায় অনেক পৃথক। সিদ্ধ র্‌গদ তসঙ পা' ও অরগ্যান-পা' এদেশে আসার পর প্রায় ৩৫০ বছর পেরিয়ে গেছে। ইলতুতমিশ প্রতিষ্ঠিত প্রথম সুলতান বংশ কবে লোপ পেয়েছে। লুপ্ত হয়েছে খলজী বংশও। ভারতের উত্তরা-পথ এখন মোগলদের দখলে। ভারতীয়রা যে বিরাট সুদিনের মুখ দেখেছে তা নয়। তবে, অনেক কাল মুসলমানদের দাপটের ছায়ায় বাস করে পরিস্থিতি অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। ইংরাজরা চলে গেলে আমাদের কী অবস্থা হবে ভেবে ইদানীংকালে যেমন অনেকে ভাবনায় আকুল হয়েছিলেন; অধীনতার বীজ দীর্ঘকাল ধরে রক্তে সংক্রামিত হবার ফলে, অনেক এ দেশী-ই তখন ভাবতে শুরু করেছেন মুসলমানেরা চলে গেলে আমাদের কী হবে। রাজার জাতি, ধর্ম, ভাষা আলাদা না হলে রাজার শাসন যে চলছে তা যেন মনেই হয় না। সে শাসন মানতে যেন মন চায় না। নিজের জাতের রাজা হাজার করলেও মন ভরে না, তার ত্রুটিটাই চোখে বড়ো হয়ে বাজে। অন্য জাতের রাজার কাছে কিছু প্রত্যাশা নেই বলে মাঝে মধ্যে তার নিছক আহা উহুকেও বিরাট পাওয়া বলে মনে হয়। মোগলেরা শক্ত হাতে শাসনের হাল ধরেছে। পরাধীন এ দেশীরা এখন এতেই খুশী। অনেকেই রাজধর্ম ও রাজ ভাষার গুণগ্রাহী হয়েছেন। এখন যেমন কথায় অকথায় ইংরাজী বলতে পারাটাকে বিদ্যাবত্তার নিদর্শন বলে মনে করে, ঠিক তেমনি তখনকার লোকও কথায় অকথায় আরবী ফারসী বলাকেই বিদ্যাবত্তার লক্ষণ বলে বিচার করতে শুরু

করে দিয়েছে।

তিব্বত থেকে ভারতে তীর্থ করতে আসা এখন আর খুব চমকপ্রদ ব্যাপার নয়। অনেকেই আসছেন। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম মুছে যেতে বসলেও ভারতই তো তার জন্মপীঠ, বৌদ্ধদের পুণ্যতীর্থ। তবে উড্যানের মতো দূর তীর্থে যাবার মতো যাত্রী কম। তাই স্তাগ তসঙ রস পা' মোটেই একা নন। বেশ কয়েকজন সঙ্গী জুটেছেন তার সঙ্গে। সবার মনে উড্যান বা অরগ্যান যাবার স্বপ্ন না থাকলেও দু'এক জনার মনে সে স্বপ্ন রয়েছে। রস পা'র মনে তো রয়েছেই। প্রেরণা যে অরগ্যান-পা'র ভ্রমণ কাহিনী থেকেই পেয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে অরগ্যান-পা'র ভ্রমণ সূচীটি সঙ্গে নিয়ে তার দেখা জায়গাগুলি খুঁজে বেড়াবার উৎসাহই বা কেন তার মধ্যে? সিদ্ধ বৃগদ তসঙ পা'র ভ্রমণ কাহিনীও তার মনে উজ্জ্বল।

রস পা'র সঙ্গীদের মধ্যে শুধু দু'জনের নাম আমরা জানি। একজন গ্রগ্স পা' রগ্ম মৎসো। আরেকজন ব্রঙ পো বজঙ পো।

তি-সে বা কৈলাস পর্বত থেকে তারা দলবদ্ধ ভাবে রওনা হলেন। মইয়ঙ পো রদসঙ ও প্রেতপুরী পার হয়ে থামলেন এসে জঙজুঙ প্রদেশের গুগেতে। এতোটা পথ একদিনেই পার হলেন।

এখানে যাকে প্রেতপুরী বলা হয়েছে, এটি আসলে সিদ্ধ বৃগদ তসঙ পা'র বিবরণে বলা তীর্থপুরী। শতদ্রু, মিশর ও আরেকটি নদীর মিলনস্থলের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরে এ শহরটি। যাত্রীরা এখনো তিব্বতের সীমানা মধ্যেই রয়েছেন।

যাত্রা শুরু ক'রে এরপর এলেন তারা কয়ুঙ লুঙ। সেখান থেকে টানা পাঁচদিন পথ চলার পর পৌঁছলেন এসে সরঙ লা বা সরঙ গিরিপথের পাদপ্রান্তে। তিব্বতী ভাষায় লা শব্দটির মানে হলো—গিরিপথ। তবে পাঁচদিনে এতদূর পথ আসা সহজ নয়। তাই দিনের হিসাবে এখানে কিছু ভুল থাকতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি তিন তীর্থযাত্রীর বিবরণ মধ্যেই দিনের হিসাব অনেক জায়গায় গোলমেলে।

গিরিপথ পার হয়ে কু-নু নামের একটি সরু উপত্যকায় হাজির হলেন। তারপর একে একে ভারতের এপারে নাম গয়াল, পু ও স পিছনে ফেলে দু'দিন পথ ভাঙার পর সোরঙ এলেন। সোরঙ থেকে এবার ক্যগস্। অর্থাৎ ভারতের সমতল বুকের দিকে।

ক্যগস্ থেকে টানা পাঁচদিন পথ চলার পর 'সু-গে-তঙ'-এর দেখা পেলেন। তার মানে তীর্থযাত্রীরা এলেন বর্তমান হিমাচল প্রদেশের ছাম্ব উপত্যকায়, সুকেতে।

আবার পথ পরিক্রমা আরম্ভ হলো। তিনদিন পর যাত্রীরা এলেন জ্বালামুখী। অর্থাৎ হিমাচল প্রদেশ পেরিয়ে তারা বর্তমান পূর্ব পাঞ্জাবের জালন্ধর এসেছেন।

আগের দুই তিব্বতী তীর্থযাত্রী বলে গেছেন, জ্বালামুখী মন্দির জালন্ধর রাজ্যের রাজধানী নগরকোটে।

রস পা'র বিবরণ যেন একটুখানি অন্যরকম। 'এর (জ্বালামুখী মন্দিরের) কাছেই একটি প্রসিদ্ধ পাহাড় রয়েছে। একে নাগার্জুনের সাধনাপীঠ বলা হয়। তারপর একদিনে (একই দিনে ?) তীর্থযাত্রীরা এলেন জালন্ধর। এ স্থানটি বজ্রকায়ের ২৪টি পীঠের একটি। ভারতীয়রা একে কঙ্কর কোট বলে। তিব্বতীয়রা বলে নগর কোট।'

'এই শহরটির পূবে স্তূপের আকারে একটি মন্দির আছে। এর ভিতরে শিরস্ত্রাণ পরা একটি পাথরের মূর্তি। নাম তার মহাদুরথ (অর্থাৎ মহাদুর্গা)। একে দেবী দো রজে পগ মো (দুর্গা প্রতিমা ?)-র আবাস বলা হয়। চতুর্বিধ জাদুকর্মের জন্য চারদিকে চারটি গর্ত আছে। উত্তরদিকে রয়েছে বলি দেবার জায়গা।'

তিব্বতী তীর্থযাত্রীরা এই মন্দিরে স্থানীয় পুণ্যার্থীদের মধ্যে একটি চমকপ্রদ ধর্মীয় প্রথা লক্ষ্য করেন। মন্দিরের পূব দিকে কোন কোন পুণ্যার্থী তাদের জিভ কেটে ফেলতেন। তাদের মধ্যে এরূপ এক বদ্ধমূল ধারণা প্রচলিত ছিল যে, এভাবে দেবীর কাছে জিভ উৎসর্গ করলে তা আবার তিনদিনের মধ্যে নতুন করে গজিয়ে যাবে।

তীর্থযাত্রীরা মিথ্যা গালগল্প বলে যাননি। হিন্দুদের মধ্যে সত্যিই যে এরকম এক ধর্মীয় প্রথা চালু ছিল, মুসলমান ও য়ুরোপীয় পর্যটকরাও সে কথা বলে গেছেন।

সিদ্ধ র্‌গদ তসঙ পা' নগরকোটের প-গ-শু শ্মশানের কাছে পাহাড়ের উপর বিধর্মীদের একটি মন্দির থাকার কথা বলে গেছেন। এই দুর্গা মন্দিরটিই কি সেই মন্দির ?

এরপর স্তাগ তসঙ পা' ও তার সঙ্গীরা নগরের দক্ষিণ দিকে লংগুরা শ্মশানে গেলেন। এটি তন্ত্র শাস্ত্রে বর্ণিত আট প্রকার শ্মশানের মধ্যে একটি। শ্মশানের জাতি নির্দেশক বিশেষ গাছটিও তাদের চোখে পড়লো।

এই শ্মশানক্ষেত্রে নাগবৃক্ষের কাছে লোকেরা বলি দিতেন। এই নাগবৃক্ষ এখানে নিয়মিত জন্মায়। শ্মশানের কাছেই রয়েছে একটি গুহা। 'তিব্বতী সাধু র্‌গদ তসঙ পা' কিছুকাল এখানে সাধনা ক'রে কাটান।

তার মানে, র্‌গদ তসঙ পা' যখন জালন্ধরে এসে পাঁচমাস কাটান, সে সময়ে তিনি এই গুহায় থেকে সাধনা করতেন।

তিব্বতী তীর্থযাত্রীরা এখানে এলে এই গুহাটিতেই থাকে। বছরের প্রথম মাসে বুদ্ধের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শনীর স্মারক উৎসবের দিনে (অর্থাৎ বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায়) ভারতের সব বুদ্ধভক্ত বা অনুগামীরা এখানে এসে সমবেত হয় ও পূজা দেয়।

'অমাবস্যার পর (বৈশাখী পূর্ণিমায়) এই উৎসব অনুষ্ঠান কালে যোগিন, সন্ন্যাসিন ও তিব্বতী তীর্থযাত্রীরা নির্বিচারে রাজপ্রাসাদে গিয়ে পূজা দেয়।'

তার মানে রাজপ্রাসাদ মধ্যে বোধহয় বৌদ্ধ চৈত্য বা মন্দির বর্তমান ছিল ও সেখানেই সকলে এ দিনটিতে পূজা নিবেদন করতেন।

'দু'টি নদীর মাঝে একটুকরো জমির উপর এ শ্মশানটি (লংগুরা)। সেখানে জলস্রোতে ক্ষয়ে যাওয়া একটি পাথর আছে। দেখতে ঠিক

মড়ার খুলির মতো। এতে স্পষ্টভাবে 'রনল হব্যোর ম' বা যোগিনী অর্থাৎ দেবী বজ্রবরাহীর মূর্তি দেখা যায়।'

তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী বজ্রবরাহীকে ধ্যানী বুদ্ধ বিরোচন-সম্ভূত বলে মনে করা হয়। এই বৌদ্ধ দেবীমূর্তিই হিন্দুতন্ত্রে ছিন্নমস্তা'র রূপ নিয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে।

'স্থানীয় লোকেরা অবশ্য এই পাথরটির উপর শুঁড়সহ গণপতির মূর্তি দেখেন। স্তাগ তসঙ পা' একথা সত্য বলে মেনে নিতে পারলেন না।'

শ্মশানটির উত্তর দিকে একটি টিলা চোখে পড়লো তার। নাম 'খ-মু-ম-ও ত্রি'।

'কঙ্করকোটের রাজা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। দেশটি বেশ সুন্দর ও উর্বরা। অধিবাসীরাও দেখতে শুনতে ভালো। রাজার বংশে "কোর-লো-সদোম পা" বা সম্বর চক্রের ধারাবাহিকতা চলে আসছে। তাই এদেশে অনেক যোগী ও সন্ন্যাসী বাস করেন।'

কঙ্করকোট থেকে পশ্চিম দিকে একদিনের পথ গেলে নরুপু। রস পা' ও তার তিন সঙ্গী সেখানে গেলেন। তারপর একে একে শ্রীনগর, পঠন্ন, নোসর, কঠুহর, পরুর্দ, পতুরর, পঠন মুস্থর, সকিরি, সলউ, ভেটসর্ভুর, সলকৌঠু, সোটকোট ও ঘোর্তসোরক।

আবার যাত্রা আরম্ভ ক'রে দুদিন পরে পৌঁছলেন ঘোর্তসোরক থেকে বলন গরতিল। এ জায়গাটিতে বহু যোগী বাস করেন। 'একটি পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের এক কিনারে একটি পাথরের উপর চোখে পড়বে অরগ্যানের অলৌকিক মূর্তি। দু'জন বিখ্যাত যোগী দ্সিন পীর ও দ্সা পীর এখান থেকে পৃথিবী গর্ভে অদৃশ্য হয়ে যান।'

এ দুই যোগীর নামের সঙ্গে মুসলমান পীর শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। ফলে এ দুই যোগী হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা মুসলমান ছিলেন এ নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

চার তীর্থযাত্রী এবার কাশ্মীরের দিকে এগিয়ে চললেন। কাশ্মীর

দেখে রস পা' যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তা অরগ্যান-পা'র বিবরণের সঙ্গে হুবহু এক। বাড়তি যেটুকু জানিয়েছেন সেদিকে মন দেয়া যাক।

'পশ্চিমে দুই নদীর মাঝে একখণ্ড ভূমি। এই-ই রামেশ্বর। এ জায়গাটি বজ্রকায়ের দুই ভুরু। পূবে পঙ-পুরে বা পম-পুরের স্তূপ। একটি হ্রদের মাঝে এটি অবস্থিত। অর্হৎ নি-ম-গু-পা'র অলৌকিক কীর্তির স্মারক হিসাবে এটি গড়া হয়েছে।

'অর্হৎ নি-ম-গু-পা' সাধনায় বসলে নাগেরা তার উপর নানারকম উপদ্রব জুড়ে দেয়। তারা তাদের মায়া ক্ষমতার প্রভাবে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করলো। কিন্তু এ ক'রে তারা নি-ম-গু-পা'র পরনের পোষাকের কোণাটুকুও ওড়াতে পারলো না। তখন তাবা তার উপরে অস্ত্র বৃষ্টি শুরু করলো। কিন্তু সব অস্ত্র ফুল হয়ে ঝরে পড়তে থাকলো। তখন তারা বুঝলো ইনি যে সে লোক নন। সবাই তার মাহাত্ম্য স্বীকার ক'রে নিয়ে তার অনুগত হলো। তারা তার প্রার্থনা পূরণ করতে চাইলো। বজ্র-পর্যঙ্কে বসার জন্য যতোটুকু জায়গা দরকার তাই তিনি তাদের কাছে চাইলেন। তাকে বসার জায়গা ক'রে দিতে শেষ পর্যন্ত পুরো হ্রদটি শুকিয়ে গেলো। এক বিরাট শহর গড়ে উঠলো সেখানে। যে শহরের লোক সংখ্যা ৩০,০০,৬০০। এখানে একটি বনানীও রয়েছে। এটি নারোপা'র কাশ্মীর আবাস।'

চীনা পর্যটক হিউয়েন-সাঙ তার বইতে এই আখ্যানটি আরো বিশদভাবে বলে গেছেন। তার বিবরণ অনুসারে এই অর্হৎ হলেন আনন্দের শিষ্য মধ্যান্তিক। তিব্বতী তীর্থযাত্রী খুব সম্ভব অর্হৎ মধ্যান্তিক-কেই এখানে অর্হৎ নি-ম-গু-পা' বলে বর্ণনা করেছেন।

গড়ে ওঠা শহরটি তার বক্তব্য থেকে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর বলেই মনে হয়। অরগ্যান-পা' তার বিবরণ মধ্যে এ শহরের লোক সংখ্যা আগে ৩৬,০০,০০০ ছিল বলে শুনিয়ে গেছেন। এই অলৌকিক সংখ্যাটিই তার বিবরণে ৩০,০০৬,০০ রূপ নিয়েছে।

তীর্থযাত্রী এরপর রাজধানী শ্রীনগরের বর্ণনা দিয়েছেন। 'কাশ্মীরের রাজধানী একটি বড়ো শহর। নাম তার ন-গ-র। এখানে বিধর্মীদের একটি মন্দির আছে। নাম ভ-রো-ম-ৎসি। এটিতে চারশোটি স্তম্ভ রয়েছে।'

ভ-রো-ম-ৎসি হলো বড়ো মসজিদ।

'পলহর সগঙ (পার্বতী পাহাড় ?)-এ একটি কুয়ার মধ্যে স্‌গ্রোল-ম-এর একটি মূর্তি রয়েছে।'

'পূব দিকে স্তাগ-সিলিম বা তখত-ই-সুলেইমন নামে একটি পাহাড় আছে। লোকে বলে এটি নাকি গ্রুদসিন বা অবলোকিতে-শ্বরের আবাস।'

রস পা' ও তার সঙ্গীরা এরপর পুষ্পহরি গেলেন। যেতে শ্রীনগর থেকে একটি দিন লাগলো। সেখানে পৌঁছে তিন সঙ্গীই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে রস পা' সেখানে দিন কয়েক থেকে গেলেন। জ্বরে ভুগে তিন সঙ্গী দেশে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। এদিকে রস পা'র একান্ত ইচ্ছা একবার সেনতা বা সন্ধ্যা পাহাড় দেখে আসবেন। এখানে নাকি চতুর্দশ নক্ষত্র (চিত্রা) মাসের ১৫ তারিখ থেকে অষ্টাদশ নক্ষত্র (জ্যেষ্ঠা) মাসের ১৫ তারিখ (অর্থাৎ ১৫ই চৈত্র থেকে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত জলপ্রবাহ দেখা দেয়।

'এ জায়গাটি বজ্রকায়ের (হাতের) আঙুল। এটি তখন পর্যন্তও বিশ্বাসীদের (অর্থাৎ বৌদ্ধ বা হিন্দুদের) অধিকারে ছিল।'

অতএব, সঙ্গীদের পুষ্পহরিতে অপেক্ষা করতে বলে তিনি সেনতা বা সন্ধ্যা পাহাড় দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

এই প্রস্রবণটিকে বর্তমানে সান্দব্রার বলা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এটি সন্ধ্যা দেবীর পবিত্র পীঠ। গ্রীষ্মের আরম্ভে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এটিতে জলের ধারা দেখা দেয় বলেই এটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। এই স্রোতধারা অবিরাম না বয়ে থেমে থেমে দিনে তিনবার ও রাতে তিনবার বয়ে চলে বলেও শোনা যায়।

সেনতা প্রস্রবণটি দেখে রস পা' অসুস্থ বন্ধুদের কাছে ফিরে এলেন। তারা দেশে ফিরে যাবার জন্য যাত্রা করলেন। এগিয়ে দেবার জন্য রস পা'ও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। কিন্তু বরন থেকে মটে যাবার পথে অসুস্থ তিন সঙ্গীর মধ্যে একজন মারা পড়লেন। অপর দু'জনের মধ্যে আরো এক সঙ্গী চিরবিদায় নিলেন মটেতে পৌঁছে। এই সঙ্গীর নাম গ্রগ্‌স পা' রগ্য মৎসো। তিন সঙ্গীর মধ্যে এখন শুধু দ্রঙ পো বজ্রঙ পো-ই বেঁচে। পরিস্থিতির চাপে নিরুপায় হয়ে মটেতে তিনদিন থেকে যেতে হলো দু'জনকে।

এই মটে বোধ হয় বৃনবর নদী তীরে থাকা মুক্তি শহর।

নতুন করে আবার দেশে ফিরে চলার যাত্রা শুরু হলো। চলতে চলতে দু'জনে এক উঁচু গিরিপথের পাদদেশে এসে পৌঁছলেন। এই গিরিপথটি সম্ভবতঃ শিলসর।

উঁচু গিরিপথ পার হবার জন্য এগিয়ে চললেন দু'জনে। চলতে চলতে দুর্বল দ্রঙ পো অনেক পিছনে পড়ে গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় স্তাগ তসঙ রস পা' গিরিপথের উপরে গিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু কোথায় দ্রঙ পো। অপেক্ষা করে করে বন্ধুর জন্যে দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন রস পা'। তবে কি পথে কোন বিপদ হয়েছে? মারা পড়েছে আচমকা? দুরু দুরু বুকে ফিরে চললেন তিনি বন্ধুর খোঁজে।

যখন আধাআধি পথ নেমে এসেছেন তখন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। নিশ্চিন্ত হলেন রস পা'। কিন্তু সেদিন আর গিরিপথ পার হওয়া সম্ভব হলো না। ভীষণ তুষারপাত চলেছে। মধ্যপথেই কাটিয়ে দিলেন সেদিনটা। পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু তুষারের দরুন এবার তাদের বিষম বেগ পেতে হলো। যোগপ্রক্রিয়া অবলম্বন করে অতি কষ্টে এগিয়ে চলতে থাকলেন তারা। অবশেষে গিরিপথ পার হলেন। হাঁটতে হাঁটতে পনেরো দিন পর পৌঁছলেন এসে তিব্বতের জঙস-দ্‌কর বা জন্‌সকর।

জন্‌সকরে মহাসিদ্ধ ব্‌দে ব রগ্য মৎসো-র সাথে ত্ু'জনের দেখা হলো। তিনি তার সাধনা-স্থলটিতে ত্ু'জনকে কিছুদিনের জন্য থেকে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। এই সাধনাস্থলীর পিছনেই নারোপা'-র জাছু-বর্ম (সাধনা-গুহা ?)। ত্ু'টি মাস তারা সেখানে কাটিয়ে দিলেন। এর মধ্যে তার অন্যান্য সঙ্গীরাও নগরকোট থেকে ঘুবতে ঘুরতে তিব্বত ফিরে এসেছেন।

পথ আবার তাকে হাতছানি দিলো। রস পা' তার ফিরে আসা সঙ্গীদের নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন। সংকল্প নিলেন, ডাকিনীদের বিচরণ ক্ষেত্র গ-শ (গর-শ) বা লাহুল যাবেন।

মহাসিদ্ধ তখন তার সাধনাস্থলীতে নেই। তার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য তারা হবর গ্‌দন এলেন। সিদ্ধ ও তার চেলাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকলে লাহুল চললেন।

লাহুল পৌঁছে সেখানকার রাজা ৎসে রিঙ দ্‌পল লদে-র কাছে তারা আশ্রয় পেলেন। তিনমাস সেখানে তারা থেকে গেলেন। এরপর এলেন তারা কঙ-গ্‌সর।

এ জায়গাটি ভাগ নদীর বাঁ পাড়ে অবস্থিত। লাহুলের এই রাজা ব্‌সোদ নম্‌স রগ্য মৎসো-র ছেলে বা ভাই ৎসে রিঙ র্‌গয়াল পো বলেই মনে হয়।

কাঙ গ্‌সর-এ রাজার ছোট বোন তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তাদের দেখাশোনা, পরিচর্যার ভার নিলেন। বোনের নাম ব্‌সোদ নম্‌স। রস পা' তাকে বিভিন্ন শাস্ত্র ও ধর্মীয় মতধারা ব্যাখ্যা করে শোনালেন। এর মধ্যে ছিল—মহামুদ্রা, নিরোপা'র ষড়বিধি, প্রাণ যোগ, ক্রিয়ানুষ্ঠান যোগাযোগ বিধি, গুপ্ত প্রক্রিয়া, ম র পা', মিল রস পা' ও দ্বগস পো র্‌জে প্রভৃতির ধর্মমত ও উপদেশাবলী, ধর্ম-বৃত্তান্ত, মণি-বক-হ্‌বুম প্রভৃতি।

এই অবসরে ঘুরে ঘুরে লাহুলের কাছেপিঠের কতক অঞ্চলও

তারা দেখলেন। যেমন গন্ধোল, গুস মণ্ডল (চন্দ্রভাগা নদীর উপকূলে), রে প'গ ও মরু। মরু বজ্রকায়ের (পায়ের) আঙুল।

শীতকালে পুরো দু'মাস তারা বিশ্রাম নিলেন গ্যুর রদ্ সোঙ-এ। গেলেন তারপর দর র্‌তে।

রো রোলঞ্চ গিরিপথ পার হবার পর এলেন লাহুলের প্রথম গ্রাম দর র্‌তে।

রাজা তখন সেখানে বাস করছিলেন। দু'মাস তার কাছে সেখানে কাটালেন তারা।……এভাবে পুরো একটি বছর রস পা' ও তার সঙ্গীরা লাহুলে কাটিয়ে দিলেন।

দর্ র্‌তে এসে রস পা'র মনে অরগ্যান বা উদ্যান যাবার বাসনা আবার তীব্র হয়ে দেখা দিলো। বন্ধুদের বললেন। কিন্তু কেউ যেতে চাইলো না। অতো দূর পথ যাবার জন্য কেউ তারা রাজী নন। শেষে মাত্র একজন ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রস পা'। প্রথমে গেলেন কঙ-গ্‌সর। তারপর স্কয়ে নঙ বা তি-নঙ। তারপর গুস মণ্ডল।

এই গুস মণ্ডল বা গুস থেকেই কুলুতের আরম্ভ। কুলুত বা কুলু বজ্রকায়ের হাঁটু।

গুস পিছনে ফেলে দু'দিন ধরে পথ চলার পর রে প'গ শহরের দেখা পাওয়া গেলো।

এখানে হগ্রো দ্রুগ সগ্রোল নেসেস রূপে স্পয়ঙ রস জয়িসের একটি মূর্তি রয়েছে। কমরু বা চন্দ্রভাগার উপর-উপত্যকা থেকে আনা পাথর দিয়ে মূর্তিটি গড়া।

ঘুরে ঘুরে রে প'গ দেখা শেষ ক'রে আবার মরুর দিকে এগিয়ে চললেন। একটি দিনেই সেখানে পৌঁছে গেলেন। আরো দু'দিন পথ চলার পর এলেন পত। তারপর হেঁটে হেঁটে কোটল গিরিপথের কাছে।

তুষারাবৃত কোটল গিরিপথ পার হয়ে পঙগি হাজির হলেন। তারপর সেখান থেকে সুর। আরো দু'দিন পরে 'ন-রঙ'। এ অঞ্চলটি কমরু নামে পরিচিত। এটি বজ্রকায়ের বগল।

কমরু পিছনে ফেলে, আরো একটি উঁচু গিরিপথ ডিঙিয়ে দু'দিন পরে একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় পৌছলেন দু'জনে। উপত্যকাটির নাম ৎসম ভে দম পা' বা ছাম্ব। এটি পার হতে সাতদিন সময় লাগলো। এরপর দেখা পাওয়া গেলো হিন্দু ত-ম-এর।

তার মানে এবার মোগল সাম্রাজ্য হিন্দুস্থানে পা রাখলেন রস পা' ও তার সঙ্গী।

এবার একের পর এক তারা পার হলেন নরুপু, শ্রীনগর, পঠন্ন, নোসর, কঠুহর, পাতুরার, পঠন মসুর, সকিরি, সলউ, ভেট সর্ভুর, সলকৌঠু, সৌট, কৌট ও ঘোৎসোরক।

অর্থাৎ, আগের বার জালন্ধরের নগরকোট বা কঙ্করকোট থেকে যে পথ ধরে রস পা' এগিয়ে ছিলেন সেই পথ ধরে এবারেও চলেছেন তিনি। তালিকায় নামগুলির যা একটু আধটু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তা দেখা দিয়েছে খুব সম্ভব লিপি-প্রমাদের দরুন।

ঘোৎসোরকের কাছেই একটি বড়ো নদী। এটি কাশ্মীর থেকে নেমে এসে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে।

তার মানে, তারা এবার ঝিলম নদীর কাছে এসেছেন।

অরগ্যান-পা'র বিবরণে আছে যে, এই নদীর অপর পারে বর-মিল (বরমূলা) নামে একটি জায়গা রয়েছে। তাই, সেখানে যাবার জন্য তিনি নদীর দক্ষিণ দিকে চারদিন ধরে এগিয়ে চললেন।

স্পষ্টতঃই তিনি ভুল জায়গায় খুঁজে ছিলেন। কেননা অরগ্যান-পা' উত্তর থেকে উড্যান হয়ে কাশ্মীরে আসার পথে বরমূলায় গিয়েছিলেন। তাই চারদিন ধরে অনেক খুঁজেও সে জায়গাটির দেখা পেলেন না তিনি।

রস পা'র সঙ্গী জি ব র্নম র্গয়াল এর ফলে অরগ্যান-পা'র

বিবরণের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন। তিনি বার বার বলতে থাকলেন—চলো, ফেরা যাক।

রস পা' তার কথায় কান দিলেন না। শুধু পথ বদলে সে এবার উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলতে থাকলেন। পনেরো দিন ধরে এক বিরাট অরণ্যরাজ্যের মধ্য দিয়ে পথ চলে 'হিল' নামে একটি শহরে উপস্থিত হলেন।

এখানে এসে এবার সে অরগ্যান-পা'র বলা হোর (ব্রহোর বা ডহোর) শহরের খোঁজ শুরু করলেন।

এথেকে বোঝা যায় রস পা' তার আগের ভুলটি ধরে ফেলতে পেরেছিলেন। যাই হোক, অরগ্যান-পা' বলে গেছেন, হোর শহরের লোক সংখ্যা ৭ লক্ষ।* অথচ কোন লোকই তাকে এ শহরের সন্ধান দিতে পারলো না। এরপর তিনি অরগ্যান-পা'র বলা বঙ হোতি (অরগ্যান-পা'র বিবরণ মতো নলকুগ্রি বা নকুত্রি) নামের খনিজ লবণ পাহাড়ের খোঁজ নিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু এরও কোন খোঁজ কেউ বলতে পারলো না। লোকে শুধু জানালো যে এদিকে খনিজ লবণের অনেক পাহাড় আছে। তবে, সব থেকে কাছে হলো ৎসোশর লবণ পাহাড়গুলি।

সেই দিকেই রস পা' এগিয়ে চলতে থাকলেন। জনমানব শূন্য ভয়ংকর অরণ্যের মধ্য দিয়ে তিনদিন পথ ভেঙে তারা মুরগ উপস্থিত হলেন। তারপর একটি বড়ো নদী পার হয়ে এগিয়ে চললেন। আরো তিনদিন পার হয়ে যাবার পর দেখা পেলেন ৎসোশর-এর।

যে বড়ো নদীটি তারা এখানে পার হলেন, সেটি সেই ঝিলম। মুরগ বোধ হয় মূল কাওয়াল। আর ৎসোশর অঞ্চলটি চুইল পর্বতমালার কাছেই হবার কথা।

* অরগ্যান-পা'র মূল বিবরণে আছে ১০ লক্ষ। এ থেকে সূচিত হয় পরবর্তীকালে লিপি প্রমাদ ফলে অরগ্যান-পা'র পুঁথিতে দেয়া মূল সংখ্যা নানা বিকৃত রূপ নিয়েছে।

রস পা'র নজরে পড়লো যে ৎসোশর উপত্যকাটি উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। আবার উপত্যকাটি ওই দু'টি দিকেই বেশি উঁচু। দক্ষিণ-পূবে ক্রমশঃ নিচু। খনিজ লবণ এখানে পাথরের আকারে রয়েছে। এর দক্ষিণ দিকে দুই বিরাট দেশ ধগন আর জমোল। খবর নিয়ে আরো জানতে পারলেন, ওই দেশ দুটিতে অনেক বৌদ্ধধর্মী ও অন্যান্য নানা সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসী আছেন। একদিকে নগরকোট, লাহোর, অভের এবং অন্যদিকে ঘোরশাল ও ঘোঠৈয়া সকম থেকে এ অঞ্চলে সবাই লবণ নিতে আসে। অরগ্যান-পা'র বৃত্তান্তে অবশ্য বলা হয়েছে যে অরগ্যান বা উদ্যানেও এখান থেকে লবণ যায়। কিন্তু বর্তমানে সে বাণিজ্য পুরো বন্ধ হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ। উদ্যান বা অরগ্যানেও লবণ আছে। তার রঙ স্ফটিক নীল।

রস পা'র ধগন বোধহয় দাক্ষিণাত্য। আব জমোল খুব সম্ভব দ্রামিড় বা দ্রামিল অর্থাৎ তামিল দেশ। গোরসল গুর্জর বা গুজরাট।

এরপর তিনি আরো এগিয়ে চললেন। গেলেন ধোদোঙ্ক। গেলেন ববুল। সেখান থেকে দু'দিন পথ চলে পৌঁছলেন মলোট্ট।

এতোদিনে অরগ্যান-পা'র বিবরণে থাকা একটি শহরের দেখা মিললো। এই মলোট্ট-ই অরগ্যান-পা'র মলকোট। আধুনিক মলোট। খোঁজ নিয়ে রাজা হুল (অরগ্যান-পা'র হুলাহু)-এর গড়া মন্দিরেরও হদিশ পেলেন। তবে মন্দিরটি আর খাড়া নেই। মোগল সৈন্যরা তাকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

অরগ্যান-পা' মলোট থেকে পাঁচদিন উত্তর-পশ্চিমে চলে রুকল এসেছিলেন। তাই রস পা' এবার 'রুকাল'-এর হদিশ শুরু করলেন। সে শহর কোথায় কেউ তাকে বলতে পারলো না। তবু দমলেন না রস পা'। উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে চলতে থাকলেন। যেতে যেতে পথে কতক তুর্কী লবণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন। তারা জানালো, সে শহর মরুর ওপারে। পথ মোটেই ভালো না। দলে দলে ডাকাত ঘোরাফেরা করছে। গেলেই তাদের

হাতে প্রাণ খোয়াতে হবে। এতো খবর দিলেও, ঠিক কোন পথ ধরে গেলে সে শহরে পৌঁছানো যাবে, তা কিন্তু তারা বলতে পারলো না। তাই যেমন উত্তর-পশ্চিম দিকে চলছিলেন তেমনিই রস পা' চলতে থাকলেন সঙ্গীকে নিয়ে।

যেতে যেতে জন পাঁচ-ছয়েক মুন-খোঁড়ালীর পাল্লায় পড়ে গেলেন দু'জনে। তাদের হাতে প্রাণ খোয়াতে খোয়াতে কোনমতে বেঁচে গেলেন। এরপর আর এগিয়ে যেতে ভরসা পেলেন না। ঠিক করলেন পিছু ফিরবেন। পরদিন ভোরবেলা সেই মতো উল্টো পথে হাঁটা জুড়ে দিলেন। কিন্তু চলতে চলতে কখন যে পথ হারিয়ে ফেলেছেন সে খেয়াল নেই। যখন জানা পড়লো তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।

সঠিক পথের নিশানা পাবার জন্য এবার পূবমুখী হাঁটতে শুরু করলেন দু'জনে। একটি পথ ধরে কিছু দূর এগোবার পর পথে একদল লবণ-বণিকের সঙ্গে দেখা। এদের দলে একজন বুড়ো ব্রাহ্মণও ছিলেন। কথায় কথায় তার সঙ্গে রস পা' ও র্নম র্গয়ালের হৃদ্যতা গড়ে উঠলো। শুনলেন, তারা রুকালের দিকেই চলেছেন। সেই যাত্রী বাহিনীর মেল-এ যোগ দিয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে এবার পথ চলতে থাকলেন।

ন'দিন একটানা পথ চলার পর একটি লবণ হ্রদের দেখা মিললো। হ্রদের নামটি যে কী তা আর রস পা'র মনে নেই। বণিকেরা সেখানে লবণ ও ঘিয়ের কেনা-বেচা ক'রে ঘরমুখী রওনা দিলো। বুড়ো ব্রাহ্মণের ছোট ভাইও তাদের সঙ্গে ফিরে গেলেন।

এই লবণ হ্রদটি আসলে কল্লর কহার-এর কাছে। বুড়ো ব্রাহ্মণ ও নতুন কতক যাত্রীর সঙ্গে দুই তিব্বতী তীর্থযাত্রী সেখান থেকে আরো এগিয়ে চলতে থাকলেন। তিনদিন পথ চলার পর তারা রুকাল এলেন।

অরগ্যান-পা' যেখানে মাত্র পাঁচদিনে এসেছিলেন, এলোমেলো

চলে ও পথ ভুল করার দরুন সে জায়গাটিতে পৌঁছতে 'রস পা' ও নাম র্গয়ালের লাগলো বোধহয় ১৫ দিনেরও বেশি।

ঘুরে ঘুরে রুকাল দেখা শেষ হলো। এরপর যাত্রীরা গেলেন অক্কিখিয়ল। সেখান থেকে একের পর এক ভত্তুপুর, মালপুর, উৎসল-পুর, সপুনপুর, রেউরেট ও অটিক। অটিকের সামনে দিয়ে বা পশ্চিমে বয়ে চলেছে সেন গে ক হব্ব বা সিন্ধু নদ।

তার মানে, যাত্রীরা শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছেন সিন্ধু নদের পূব পাড়ে থাকা অত্তিক শহরে।

নদী পার হলেন যাত্রীরা। গেলেন এবার ম-ৎসিল-ক-নথ-ত্রিল। তারপর সেখান থেকে পোর, নোশর ও মতঙ্গন হয়ে মিঠাপানি।

নোশর নিঃসন্দেহে নৌশের। পোর বোধহয় পিরান।

মিঠাপানি একটি প্রস্রবণের নাম। এর জলের স্বাদ নোনতা। চালু প্রবাদ অনুসারে পদ্মসম্ভবের প্রস্রাব থেকে এ প্রস্রবণটির জন্ম।

এ পর্যন্ত বুড়ো ব্রাহ্মণটি তাদের সঙ্গে আছেন। আছেন আরো তিনজন যোগী ও একজন গৃহস্থ। গৃহস্থের নাম অতুমি।

মিঠাপানিতে ৎসাহুলহায়ি নামে একজন লোক তাদের দেরি করিয়ে দিলো। বললো, সেও তাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু পোষাক-আশাক কাচার জন্যই হোক কিংবা খারাপ আবহাওয়ার জন্যই হোক সে অপেক্ষা করলো।

এ লোকটি বোধহয় একজন মুসলমান। আসল নাম সম্ভবতঃ শহীতুল্লাহ।

আবার যাত্রা আরম্ভ হলো। তবে বুড়ো ব্রাহ্মণ আর তাদের সঙ্গে গেলেন 'না। তিনি এখান থেকেই বিদায় নিলেন নিজের দেশে ফিরে যাবেন বলে। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে রস পা' ও ব্নম র্গয়াল এগিয়ে চললেন। গেলেন একের পর এক মাধ, অৎসিমি, পাকশিলি, ধমধোঙ, কাটুহর, ডঠুরবর, পঠপমগে, মুতাদিন্, কবোল, কান্দাহার ও হসোনগর।

এর মধ্যে পাকশিলি সম্ভবতঃ বকশলি। আর এ ক্ষেত্রে মাধ হয়তো বা মরদান।

হসোনগরের পর তীর্থযাত্রীরা একটি নদী পার হলেন। তারপর সেখান থেকে পরুক ও নসভল হয়ে সিকির গেলেন।

সিকিরে রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোরে আবার যাত্রা আরম্ভ করলেন তারা। সবে একবেলার পথ পার হয়েছেন এমন সময় ডাকাতের দল ঘিরে ফেললো তাদের।

রস পা' অরগ্যান তীর্থ করতে চলেছে শুনে ডাকাতের দল গর্বভরে জানালো যে, তারা কপুর বা উড্ডান থেকেই আসছে।

রস পা'র মাথায় আঘাত করলো তারা। তারপর বন্দী ক'রে মাথার চুল ছেঁটে দিলো। সন্ন্যাসীর পোষাক খুলে নিয়ে পরিয়ে দিলো অন্য পোষাক। তারপর ক্রীতদাস হিসাবে দিলো তাকে বিক্রী ক'রে কয়েক তঙ্কা কয়েক পয়সায়।

অন্যদের যে কী দুর্দ্দশা হলো তা আর শোনাননি রস পা'। মনে হয় এই একই দশা হয়েছিল সকলের।

রস পা'কে যাদের কাছে বিক্রী করা হলো, তারা আবার দু'ভাই। তাকে কিনে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন তারা। পথে যেতে যেতে তারাও আবার নতুন একদল ডাকাতের হাতে পড়লেন। তবে, বোধ হয় ভদ্র গোছের ডাকাত। তাই সব কিছু লুটে নিলো না। কিছু মুক্তিপণ খসিয়ে রেহাই পেয়ে গেলেন।

আবার কিছুদূর যেতে না যেতে আবার আরেক দল ডাকাত। কপালগুণে এবারেও মুক্তিপণ দিয়ে রেহাই মিলে গেলো তাদের।

রস পা'কে নিয়ে অবশেষে দু'ভাই তাদের বাড়ি পৌঁছালো। বাড়ি তাদের মোমোলবজ্র।

যে জন্য ক্রীতদাস কিনে আনা, এবার রস পা'কে তারা সেই কাজে লাগিয়ে দিলো। রস পা' কী আর করেন, মুখ বুজে সারাদিন তাই ক'রে চললেন।

বিকাল হতে রস পা' কোন কাজের কথা কানে তুললেন না। সব কিছু ফেলে রেখে জোরে জোরে প্রার্থনার মন্ত্র আওড়াতে শুরু ক'রে দিলেন।

ক্রীতদাসের এমন বেয়াদবি দেখে বাড়ির বুড়ো কর্তা গেলেন চটে। ওর দুর্বোধ্য তিব্বতী ভাষায় ওই চীৎকারে তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। বার বার থামতে বললেন। কিন্তু কে শোনে। রস পা' তখন ভাবের ঘোরে মশগুল।

তখন নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না বুড়ো কর্তা। একটা লাঠি নিয়ে দিলেন বসিয়ে ওর মাথায় দু'ঘা।

জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন রস পা'। চেতনা ফিরে আসার পর যোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে নিজেকে সুস্থ ক'রে তুললেন। মনে মনে ঠিক করলেন—আর এখানে নয়, যেমন ক'রে হোক পালিয়ে যাবেন।

এক সময়ে সুযোগও জুটে গেলো।

অচেনা দেশে একা এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে সিথর নামে একটি শহরে এসে হাজির হলেন। বোধহয় পলাতক দাস সন্দেহ ক'রে কিংবা তাকে ধরে দাস হিসাবে বিক্রী ক'রে দেবার মতলবে আবার কিছু লোক এখানে তাকে ছেঁকে ধরলো। পাশেই উপস্থিত ছিলেন এক ব্রাহ্মণ। রস পা' তার শরণ নিলেন। জানালেন যে তিনি কাশ্মীর বাসী তিব্বতী নন। মহাচীন থেকে আসা তিব্বতী।

পুরো বিদেশী জেনে ব্রাহ্মণের মনে বোধ হয় করুণার সঞ্চার হলো। সবাইকে তিনি বুঝিয়েশুঝিয়ে শান্ত ক'রে রস পা'কে উদ্ধার করলেন। তাকে উপদেশ দিলেন 'ভইয় শহুর' চলে যাবার জন্য।

রস পা' আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। পথের সন্ধান জেনে নিয়ে 'ভইয় শহুর' যাবার জন্য চলতে শুরু ক'রে দিলেন। সেখানে পৌঁছে অনেক যোগিনের সঙ্গে তার দেখা হলো। এদের যিনি প্রধান, তার নাম বুদ্ধনাথ। তারা আনন্দের সঙ্গে তাকে গ্রহণ

করলো। একটি ভারতীয় নামও দিলেন তারা তাকে। সবাই তাকে ডাকতে শুরু ক’রে দিলেন সমোনাথ (সোমনাথ বা শম্ভুনাথ) বলে।

এই সব সাধুদের কানে ফুটো রয়েছে। সবাই তাদের ‘মুণ্ড’ বলতো।

স্তাগ তসঙ রস পা’ গুরু জ্ঞাননাথের কাছে গুর্গনাথ বা গোরক্ষনাথ ও অন্যান্য আরো অনেক যোগিন মতধারা শিক্ষা করলেন।

এই শহরে খুব কুস্তির চল ছিল। রস পা’ও সেই দলে ভিড়ে কুস্তি কসরতের চর্চায় সাহায্য ক’রে চললেন।

এখানে একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর ছিলেন। শহরের কোন কুস্তিযোদ্ধাই তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন না। একজন তুর্কী পদস্থ রাজকর্মচারী একদিন নাক উঁচিয়ে তাকে লড়াইয়ের ডাক দিয়ে বসলো। নিজে খুব ওস্তাদ লড়িয়ে বলে কর্মচারীটির মনে বেজায় দেমাক। তাই, অন্যেরা বারণ করলেও কারো কথায় সে কান দিলো না।

নির্দিষ্ট দিনে লড়াই আরম্ভ হলো। কুস্তিগীর সহজেই কর্মচারীটিকে কাবু ক’রে ফেললেন। খারাপ ভাবে জখম হয়ে সে তখন লড়াই থামাবার জন্য আকুল আবেদন ক’রে চললো। কিন্তু কুস্তিগীর তার সে আবেদন মোটে কানে নিলেন না। লোকটি খতম না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন।

শহরের সীমানায় তসন উর স্গরোগস প নামের একটি শ্মশান রয়েছে। এখানে থাকা আটটি শ্মশানের মধ্যে এটি অন্যতম। শ্মশানের পাশেই একটি নিবিড় বন। ধর্মী-বিধর্মী সকলেই এখানে শব নিয়ে আসে। ধর্মীরা শব দাহ করে, বিধর্মীরা কবর দেয়।

‘গুপ্ত সাধনার জন্য অনেকেই এ শ্মশানটিতে যায়। মৃতরা কবর ফুঁড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, এ দৃশ্য সেখানে গেলে চোখে পড়বে। অনেক ডাকিনীও আছে। তাদের গায়ের রঙ অন্ধকারের মতোই

কালো। পুরো ন্যাংটো সবাই। হাতে মানুষের হৃৎপিণ্ড কি অস্ত্র। গুহ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে।'

'অন্য নানারকম খেল কসরতও এখানে চালু রয়েছে। ঢাল-তলোয়ারের প্রতিযোগিতাও দেখা যায়। এই প্রতিযোগিতায় দু'জন লড়িয়ের মধ্যে একজনের হাতে থাকে শুধু ঢাল, অন্য জনের হাতে শুধু তলোয়ার। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ঢাল যদি শেষ অবধি ভেঙ্গে যায় তাতে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে না পেরে যদি জখম হয় বা মারা পড়ে, তবে তা কলঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।'

'বছরের প্রথম মাসে, বুদ্ধদেবের মহান অলৌকিক ঘটনাবলীর স্মরণে যে বিরাট উৎসবের দিনটি পালিত হয়, তখন এখানে এক বিরাট মেলা বসে। নানা দিক থেকে নানান যোগিন ও সন্ন্যাসীরা এই মেলায় এসে জমায়েৎ হন।'

রস পা' জানতে পেলেন যে, অরগ্যান থেকেও একজন যোগী এই মেলায় এসেছেন। এ খবর পেয়ে তিনি তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। যখন সে দেখলো, এই যোগী তার ডাকাত দলের হাতে বন্দী হওয়া থেকে সব ঘটনাই জানেন, রস পা' ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

অরগ্যান বা উদ্যানের এই যোগী মেলা থেকে হসোনগর রওনা হলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, দশদিনের মধ্যেই তিনি আবার এখানে ফিরে আসবেন। ঠিক হয়ে রইলো, তিনি ফিরে এলে রস পা' তার সাথে অরগ্যান যাবেন।

কথা মতো তার পথ চেয়ে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে রইলেন রস পা'। কিন্তু দশদিন কেটে গেলেও যোগী ফিরে এলেন না।

এতোদিন নানা অসুবিধার চাপে যে ইচ্ছার আগুন ছাই চাপা ছিল, যোগীর দেখা পাওয়ায় তা আবার উত্তাপে গনগনে হয়ে উঠেছে। তাই, যোগীর দেরি দেখে রস পা'র আর তর সইলো না। যাবার জন্ত একা একাই তিনি পা বাড়ালেন।

স্থানীয় সব সাধুরা, এমনকি মহাযোগী বুদ্ধনাথও তাকে নিষেধ করলেন। বললেন : ইচ্ছে হয় ধগন (দাক্ষিণাত্য) যাও, হিন্দুতম (হিন্দুস্থান) কি লাহোর যাও কিন্তু অরগ্যান যেও না। সেখানে অগুণতি পাঠান। তারা তোমায় শেষ ক'রে দেবে।

সবাই এভাবে বাধা দিতে রস পা' বিব্রত হয়ে পড়লেন। শেষে, যেন মত বদল করেছেন এই ভঙ্গিতে সবাইকে বললেন : বেশ! যখন বেরিয়েছি, তখন হিন্দুতম-ই যাওয়া যাক! কোন্ পথ ধরে গেলে সহজে, নিরাপদে পৌঁছতে পারবো তাই বলে দিন।

পথে বেরিয়ে রস পা' কিন্তু হিন্দুস্থানের ধার দিয়েও গেলেন না। সোজা হসোনগরের পথ ধরলেন উদ্যানের সেই যোগীর সঙ্গে মিলবেন বলে।

যোগীর নাম পালনাথ। হসোনগরে পৌঁছে রস পা' তার খোঁজ শুরু করলেন। তিনি তখনো সেখানেই ছিলেন। তাই আর হতাশ হতে হলো না, রস পা' সহজেই তার দেখা পেয়ে গেলেন।

যোগী পালনাথ ছিলেন পাঠান (মুসলমান)। পরে সে ধর্ম ত্যাগ করে এই (বৌদ্ধ?) ধর্মে দীক্ষিত হন। অরগ্যান বা উদ্যানে তিনি বহু বছর কাটিয়েছেন।

হসোনগর থেকে পালনাথের সঙ্গে রস পা' বেরিয়ে পড়লেন। একদল বণিকের সঙ্গে যোগ দিয়ে উদ্যানের পথে এগিয়ে চলতে থাকলেন।

যাত্রা পথে প্রথমে তারা একটি ছোট নদী পার হলেন। তারপর পরুব, হ্যপল, অপুক, কিল্লিতিল ও সিক'ইর হয়ে এলেন মোমোলবজ্র।

এই মোমোলবজ্রেই দু'ভাই রস পা'কে দাস হিসাবে কিনে এনেছিলেন। ওই সময়ে রস পা' হসোনগরের পর একটি নদী পার হয়ে তারপর পরুক, নসভল ও সিকির যান ও সেখান থেকে মোমোলবজ্র আসেন। দু'টি ভ্রমণ তালিকা মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়

এবারকার পরুব ও আগেকার পরুক একই জায়গা। এবারকার স্থপল ও আগেকার নসভল-ও এক। এবারকার সিক'ইর ও আগেকার সিকির অভিন্ন।

তিব্বতী তীর্থযাত্রীদের বিবরণে এক নাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম রয়েছে। যারা পরে তাদের পুঁথি নকল করেছেন, এ ত্রুটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরই। তীর্থযাত্রীরাও কোন বিশেষ নিয়ম মেনে ভারতীয় নামগুলি তিব্বতী ভাষায় রূপান্তর করেননি। এসবের দরুন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বলে যাওয়া নামগুলির সঠিক পাঠ ও তার প্রকৃত ভারতীয় রূপ—এসব জানা কঠিন হয়ে পড়েছে। আর এই অসুবিধার জন্য অনেক জায়গা ও লোকের নাম সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

যাইহোক, আবার মূল কাহিনীতেই ফিরে আসা যাক্। মোমোলবজ্র পিছনে ফেলে এরপর তারা একের পর এক গেলেন সিনোর, পেলহর, মুথিল্লি, মুসম্বি, মুথিকৃসি, মহাতিল্লি, সলাহুল্দা, কলভ্যংসি, সঙ্গিলধুব ও গোঠইয়শকম। শেষের জায়গাটি পার হয়ে এবার তারা একটি উঁচু গিরিপথের পাদদেশে উপস্থিত হলেন।

গিরিপথ পার হয়ে অবশেষে তারা অরগ্যান বা উদ্যান রাজ্যে পা রাখলেন। তারপর আরো তিনদিন পথ চলে হাজির হলেন যমকটি। এটিই হলো এদেশের রাজধানী। রাজা এখানেই থাকেন। 'নাম তার পর্তসগয়। অরগ্যানের ৭০,০০০ প্রাচীন শহরের তিনিই অধীশ্বর।'

রাজা যোগী পালনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই, এদেশ ভালোভাবে চেনে-জানে এমন একজন লোককে দিশারী হিসাবে তাদের সঙ্গে দিলেন।

ঘুরতে ঘুরতে পাঁচদিন পর তারা য়লোম-পেলোম পর্বতে এলেন। "এটি জম্বুদ্বীপের আটটি শ্রীপর্বতের একটি (অরগ্যান পা'র মতে ১২টি শ্রীপর্বত)। এর পাদদেশে 'জাতি' নামে একপ্রকার ভেষজ গাছ

জন্মে। মাঝে শ্বেত চন্দনের নিবিড় বন। উপরে জাফরানের ক্ষেত। মাঝে একটি পুকুর আছে। রাজা ইন্দ্রভূতি সেখানে স্নান করতেন। পুকুরের পাড়ে অনেকগুলি চৈত্য রয়েছে। সুন্দর খোদাই কাজ করা। রক্ত চন্দনের কড়িকাঠ দেয়া। পর্বতটির চূড়া হিমালয়ের চেয়েও উঁচু।"

রস পা' ও পালনাথ সেখানে সাতদিন থেকে গেলেন। পর্বতের কাছে নিবিড় অরণ্য ভরা উপত্যকা। অরণ্য মাঝে নানা বন্যপ্রাণী। সব রকমের বিষাক্ত সাপ।

তারপর তারা পর্বতের অন্য দিকটিতে গেলেন। 'সেখানকার উপত্যকাটির আকার ঠিক একটি আট পাপড়িওয়ালা সুপ্রস্ফুটিত পদ্মের মতো। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত।'

যে পর্বতটিকে রস পা' এখানে য়লোম-পেলোম বলেছেন, এইটিই হলো প্রসিদ্ধ ইলো বা হিলো পর্বত।

তিনদিন পর তারা করকৃশর পৌঁছলেন। তার পাঁচদিন পর রায়িশর।

করকৃশর হলো করকার গিরিপথ।

রায়িশর অরগ্যান পার রয়িকর, রাজা ইন্দ্রভূতির রাজধানী। এ শহরের বর্তমান নাম সইডু।

রস পা' লক্ষ্য করলেন, অরগ্যান বা উড্ডানের এই অঞ্চল পর্যন্ত লোকদের চাল-চলন-প্রথা ভারতীয়দের মতোই। তারপর থেকে পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। পরবর্তী অঞ্চলের মেয়ে-পুরুষ সকলেই রত্ন-খচিত কোমর বন্ধনী আঁটে। এটি দেখতে অনেক সময়ে কালোরঙা সাপের মতো। কখনো-বা সাপের গায়ের মতোই ডোরা কাটা। মাথায় পশমকে উত্তাপে জমাট ক'রে তৈরী করা কালো রঙের টুপী। এর গায়ে নানারকম রত্ন বসানো। মেয়েরাও পদ্মসম্ভবের মতো একটি টুপী পরে। তবে এ টুপীতে কোন পাড় বা সেলাই করা ভাঁজ নেই। মেয়ে-পুরুষ সকলেই কানে দুল, বাহুতে অনন্ত ও

হাঁটুতে আংটি পরে। এগুলি হয় রূপা নয়তো মাটি দিয়ে বেশ মানানসই ভাবে তৈরী।

যাইহোক, রায়িশরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ইন্দ্রভূতির নয়তলা প্রাসাদ। এ সময়ে সেটি আর খাড়া ছিল না। তার ধ্বংসাবশেষই যা রস পা'র চোখে পড়লো।

যে ধ্বংসাবশেষটিকে রস পা' ইন্দ্রভূতির রাজপ্রাসাদ বলে মনে করেছেন, সেটি হয়তোবা রাজা গির-এর দুর্গের অবশেষ।

রায়িশর থেকে রওনা হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে তিনদিন পথ চলার পর দু'জনে রহোরভ্যয়র নামের একটি বড়ো শহরে এলেন। "এ শহরটি এমন একটি অঞ্চলে অবস্থিত যে (উদ্যানের) পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ যেদিক থেকেই তুমি এখানে আসতে চাও না কেন, ঠিক সাতদিনে এসে পৌছবে। শহরের মাঝে একটি বিহার রয়েছে। মহান রাজা ইন্দ্রভূতি এটি গড়ে গেছেন। নাম মঙ্গলহোর। এতে একশোটি স্তম্ভ রয়েছে। অনেকগুলি চৈত্য (বা সাধনা কক্ষ)-ও দেখা যাবে। মণ্ডলসহ গুহ্য সমাজের চৈত্যটি (বা সাধনা কক্ষটি) বিশেষ ভাবে দেখার মতো।"

তীর্থযাত্রীদের দেখা এ শহরটির আধুনিক নাম মাঙলাওয়ার।

এ জায়গাটি থেকে উত্তর-পশ্চিমে অবশ্য আরো জনবসতি রয়েছে। কিন্তু সেখানে কোন মন্দির নেই। দেখার মতো অন্য কিছুও নেই। তাই স্তাগ তসঙ রস পা' ও পালনাথ রায়িশর ফিরে এলেন।

রায়িশর থেকে এবার দু'জনে উড্ডীয়ান বা উদ্যান (বর্তমান উদিগ্রাম) দেখার জন্য রওনা হলেন। রায়িশরের কাছেই একটি ছোট নদী বয়ে চলেছে। সেটি পার হয়ে তারা এগিয়ে চললেন। একদিন পথ চলার পর সেখানে পৌছে গেলেন।

'সেদিনটি ছিল বিশেষ এক উৎসবের দিন। বৌদ্ধ পঞ্জিকার তৃতীয় (আষাঢ়) মাসের দশ তারিখ। অনেক লোক সেখানে

জমায়েত হয়েছে। নাচ গান করছে। বিনা দ্বিধায় সব রকমের মদ পান চলেছে।'

এ জায়গাটি (অর্থাৎ মূল উড্যান শহর, যা বর্তমানে উদিগ্রাম নামে একটি ছোট গ্রাম) অরগ্যান (বা উড্যান রাজ্য)-এর হৃদিবিন্দু।

উড্যানের উত্তর ভাগে গিয়ে তীর্থ যাত্রীরা একটি ছোট মন্দির দেখতে পেলেন। ভিতরে রক্ত চন্দন দিয়ে তৈরী যোগিনীর অলৌকিক মূর্তি। মন্দিরের পিছন দিকে হুদস্নুনাথ নামের এক যোগিনী বাস করে। শোনা গেলো তার বয়স নাকি হাজার বছর পার হয়ে গেছে। দেখলে মনে হবে বয়স বুঝি পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর।

"এখান থেকে 'কমলবির' (অরগ্যান-পা'র কাম-কক্ষ বা কামোধক) পাহাড় চোখে পড়ে। এর চূড়া সব সময়ে অনুপম ইন্দ্রধনুর আড়ালে ঢাকা। যখন ইন্দ্রধনু মিলিয়ে যায় তখন তাকে রূপায় গড়া শিরস্ত্রাণের মতো মনে হয়। তন্ত্র-সাহিত্য অনুসারে এ পর্বতটি ধর্মগঞ্জ বা ধর্মের আগার, হেরুকের অলৌকিক প্রাসাদ।"

"পর্বতটির সামনের দিকে একটি গুহা আছে। এটি 'বজ্র'র পবিত্র গুহা। অথবা, অরগ্যান-পা'র বিবরণ মতো, লবপা'র মায়া-গুহা।"

"ভারতীয় সবাই এ পর্বতটিকে হৃদ্সি কল্প (ঋষি কল্প ?) বলে ও এটি 'কোটস' (কোট্ট বা দুর্গা ?)-র আবাস।"

"পাহাড়টির পিছন দিকে একটি সরোবর রয়েছে। এটি ধনকোষের 'সিন্ধু মহাসমুদ্র' নামে পরিচিত। চলতি ভাষায় ভারতীয়রা একে 'সমুদ্র সিন্ত' (সমুদ্র সিন্ধু) বলে। সরোবরটি এখান থেকে মাত্র একদিনের পথ দূরে।"

রস পা'র ইচ্ছে ছিল সরোবরটি দেখবেন। পালনাথ মানা করলেন। বললেন: গিরিপথ ডিঙিয়ে ওদিকে যাবার কোন মানে হয় না। ওই হ্রদটি ছাড়া ওপারে আর কোন কিছুই দেখার নেই।

অগত্যা চুপ হয়ে যেতে হলো রস পা'কে।

'দক্ষিণ দিকে একটি ছোট পাহাড়। মঙ্গলপানি নামে একটি প্রস্রবণ নেমে এসেছে পাহাড়টি থেকে। চলতি ভাষায় সবাই একে আয়ুপানি বলে। এর জল অমরত্ব দান করে বলেই এ নাম।'

এবার উদিগ্রাম থেকে বিদায় নেবার পালা। দুই তীর্থযাত্রী আবার পথ চলা শুরু করলেন। দুদিন পথ ভেঙে এলেন সেই উড্ডীয়ান বা 'অরগ্যান-এ যা ধূমতাল নামেও পরিচিত।'

রস পা'র 'অরগ্যান' তীর্থ করার সাধ পূর্ণ হলো। তৃষ্ণা মিটলো। এবার ফেরার পালা। অতএব আবার রায়িশর রওনা হলেন পালনাথের সঙ্গে। সেখান থেকে মিদোর। মিদোর থেকে করগ্‌শর বা করকার গিরিপথ।

করগ্‌শরে একটি অভিনব দৃশ্য চোখে পড়লো। একটি স্ত্রীলোক মুখ থেকে আগুন বার ক'রে চলেছে আর পাগলের মতো নাচছে, গাইছে। ভয়ে কেউ আর তার কাছে যেতে ভরসা পাচ্ছে না।

এরপর দু'জনে এলেন সদিভোর। তারপর কবোক। অরগ্যান-পা' এই কবোকেই উদ্যানের শাসনকর্তা রাজদেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

কবোক পিছনে রেখে আবার চলতে থাকলেন দু'জনে। এলেন ভংসভসভসোর। এ জায়গাটি বোধহয় অরগ্যান-পা'র দেখা ভিকরোভস।

তারপর ফিরলেন তারা যমকটি—উদ্যানের রাজধানীতে, রাজার প্রাসাদে।

রাজা তখন তার বাগানে ছিলেন। তিনি সেখানে একটি দর্শনীয় চিড়িয়াখানা গড়ে তুলেছেন। পারসীক সিংহ, বরাহ প্রভৃতি নানারকম জন্তু জানোয়ার রেখেছেন। কয়েকজন বিশেষ অভিজ্ঞ লোক তাদের দেখাশোনা করে।

পালনাথ আর এগোলেন না। তিনি রাজার কাছেই থেকে

গেলেন। রস পা' পালনাথ ও রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিন্ধু নদের দিকে এগিয়ে চললেন। রাজা দিশারী হিসাবে সঙ্গে একজন লোক দিলেন।

পাঁচ দিন টানা পথ চলার পর রস পা' সিন্তুপাণি বা সিন্ধুনদের কূলে এসে পৌঁছলেন। নদ পার হয়ে এলেন রজহুর। অরগ্যান-পা' উড্যান যাবার পথে এখান থেকেই সিন্ধুনদ পার হয়েছিলেন।

দু'দিন পরে রস পা' একের পর এক পিছনে ফেলে এলেন নীল, কমথে, নেপলে, নিলউ, লংক, হোরঞ, অসকম্নি, মহত সিনধে, ঘেলম্রি। ছ'দিন পরে এলেন গোরশল। দু'দিন পরে কল্ল, রুকাল, রহোরবুণ্ড, রবত, সতা, হৃতি, ৎসিরু, রুটা (রোহটাস), জেলম (ঝিলম), সর, ভেবর, নোশর, রতস্নুগ (রজৌরী)।

এর তিন দিন পর তিনি লিথন এলেন। তারপর দু'টি গিরিপথ পার হয়ে হাজির হলেন একটি সংকীর্ণ উপত্যকায়।

উপত্যকা ভেঙ্গে এবার একটি উঁচু গিরিপথের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নাম এর পিরবঞংস। তার মানে পির পঞ্জল। তার-পর চলতে চলতে দু'দিন পর এলেন কাশ্মীর (শ্রীনগর)।

শ্রীনগর থেকে আবার তিনি প্রসিদ্ধ পুষ্পহরি শহর দেখতে গেলেন। এর নিচের দিকে জাফরানের ক্ষেত। পাশেই একটি বাজার রয়েছে। নাম স্পঙপুর।

স্পঙপুরকে পমপুর বলেই মনে হয়। এটি শ্রীনগর থেকে ৭ মাইল দূরে।

সেখান থেকে আবার তিনি গেলেন সেনতা বা সন্ধ (সন্ধ্যা) পাহাড়ে। সেখানকার পাহাড়ী প্রস্রবণে স্নান ক'রে ফিরে এলেন শ্রীনগর।

তারপর রস পা' সেখান থেকে যাত্রা করলেন বরন। গিরিপথ পার হয়ে দু'দিন লাগলো সেখানে পৌঁছতে।

বরন থেকে তিনি রওনা হলেন মটে বা মতে। তারপর সেখান

থেকে নির্জন অরণ্য প্রদেশের মধ্য দিয়ে টানা দশদিন পথ চলে ফিরে গেলেন তিব্বতের জনস্‌কর।

জনস্‌কর পৌঁছেই যাত্রা শেষ হলো না। রস পা' এবার চললেন মরিয়ুল বা লাডাকের দিকে।

বর্তমানে লাডাক কাশ্মীরের অন্তর্গত। রস পা'র সময়ে এটি স্বাধীন পার্বত্য রাজ্য ছিল। মোগলদের হাত সে পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানকার রাজা ও মন্ত্রীরা রস পা'কে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে সে রাজ্যে বরণ ক'রে নিলেন।

স্তাগ তসঙ রস পা'-র নামের সঙ্গেও পরে অরগ্যান-পা' বা অরগ্যান থেকে আসা মানুষ খেতাবটি যুক্ত হয়। এর ফলে তার আর এক নাম দাঁড়ায় অরগ্যান পা' নগ দ্‌বন দ্‌গ্যাম্‌ৎসো।

লাডাকের রাজপঞ্জীতে বলা হয়েছে, তিনি সেখানকার রাজা সেঙ গে র্‌গয়ালের সমকালীন ছিলেন।

রস পা'র জীবনী বইটি এই হেমিসের বিহার থেকেই ছেপে প্রকাশ করা হয়। লেখেন ব্‌সোদ নমস র্‌গয়াল ম্‌ৎস' অন দ্‌পল ব্‌জন পো। উপরোক্ত লাডাক-অধিপতির আমলেই এটি লেখা হয়।

কোলোফোনের মতে রস পা' এটি নিজেই লিখে গেছেন। লাডাকের রাজা সেন গে ব্‌নম র্‌গয়াল ও রানী স্কল ব্‌জন সগ্রোল ম্‌-এর পৃষ্ঠপোষকতায় লাডাকে ছাপা হয়ে প্রকাশ পায়।

এই লাডাক রাজের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫৯০ থেকে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ।

অতএব রস পা' ছিলেন মোগল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক।



অরগ্যান পা'র ভ্রমণ পথ

গ্‌দন দমর—gDon dmar [একবেলা]

তিসে বা কৈলাসের উত্তর ফটক—North door of Tise

মপম হ্রদ বা মান সরোবর—Map'am lake

কুলু—Kulu

মরু—Maru

গর্ণতম পাহাড়—Garṇatama mountain

জালন্ধর : নগর কোট—Jalandhar : Nagarkeṭe (Nagarkot)

লঙ্গুরা শ্মশান—Laṅgura Cemetry [কুড়িদিন]

চন্দ্রভাগা নদী—Chandrabhaga river

ইন্দ্রনীল—Indranila on the river

ভ্রমিল বা বরমিল—Bhramila or Baramila [একদিন]

শিল—

কাশ্মীর থেকে বয়ে আসা নদীর তীরে মোঙ্গলদের শহর

ব্রহোর বা ভহোল—Brahor or Bhahola [একদিন]

নউগ্রি বা নউত্রি (নউগিরি)—Na'ugri or Na'utri [এক বা তিন দিন]

মলকোটে (মলকোট)—Malakote (Malakota) [পাঁচ দিন]

রুকল—Rukala [চারদিন]

রজহুর—Rajahura

সিন্ধু নদ—Sindhu river

কলবুর—Kalabur

ভিক্‌রোভস—Bhik'robhasa [একদিন]

কবোক, কয়োক—Kaboka or Ka'oka [একদিন]

ভোনেলে, ভেনেলে—Bhonele, Bhenele

সিদ্ধভোর—Siddhabhor [একদিন]

করগ্‌কর—K'aragk'ar

কোদম্বর নদী—Kodambar river

ইলো পর্বত—Ilo mountain [একদিন] [কবোক বা কয়োক থেকে সাতদিন]

রয়িকর—Rayik'ar

মঙ্গলয়োর—Maṅgalaor [একবেলা]

ধুমতাল—Dhumt'al

কম-ওঙ্ক পর্বত (কমলগ্লুপ বা কমল গুম্ফা—Kama'onka mountain (Kamala glupa cave)

মঙ্গল পাণি—Mangala paṇi [পাঁচ দিন]

ঘরি—Ghari [সাতদিন]
উরশর—Urśar [তিনদিন]
ৎসিক্রোট—Tsik'rota [একদিন]
রমিকোটি (রশ্মিশ্বরী)—Ramikoti (Rasmisvari) [নয়দিন]
রদোরজেমুল (ব র মূ লা)—rDor-jemula
কাশ্মীর—Kashmir
জালন্ধর—Jalandhar

রস পা'র ভ্রমণ পথ

তিসে বা কৈলাস পর্বত—Tise
ময়ঙ পো রি র্দসন—Myan po ri rdson
প্রেতপুরী (তীর্থপুরী)—Pretapuri (Tirthapuri)
কয়ুঙ লুঙ—K'yuṅ luṅ
সরঙ-লা—Sarang la
র্নম র্গয়াল (নাম গয়াল)—rNam rgyal
পু-স—Pu sa
সোরন—Soran
কয়গস্—K'yags
সুগেতন—Sugetan
দ্বলমুখে (জ্বালামুখী)—Dvalamukhe
জালন্ধর : কঙ্গরকোট (কঙ্করকোট) —Jalandhar : Kaṅgarkot
লঙ্গুরা শ্মশান—Langura Cemetry [একদিন]
নুরুপু—Nurup'u
শ্রীনগর—Srinagara
পঠন্ন—Paṭhanna
নোসর—Nosara
কঠহর—Kaṭhuhara
পরুর্দ—Parurda
পতুরর—Paturar
পঠনমুসুর (পাঠানমুসুর)— Paṭhan-musur
সকিরি—Sakiri
সলউ—Salau
ভেটসরভুর—Bhets'arbhura
সলকউঠু—Salakauṭhu
সোট কোট (শতকোট)—Soṭa-koṭa
ঘোরৎসোরক বা ঘো ৎ সো র ক—Ghortsoraka [দুইদিন]
বলনগরতিল—Balangaratila
কাশ্মীর—Kashmir
বরন—Baran [একদিন]
মটে—Maṭe
জঙস্ দকর—Zans dkar
হ্বর গ্দন—h Bar gdan
গ-শ (গরশা)—Ga śa
কন গসর-দর রৎসে—K'an gsar-Dar rtse
স্কয়ে নঙ—Skye naṅ
গুসমণ্ডল—Gusamandal [দুই দিন]

রেপগ – Rep'ag [একদিন]
মরু—Maru [দুই দিন]
পত—Pata
কোটল গিরিপথ—Kaṭala pass
পঙগি—Paṅgi
সুরু—Sura
নরন – Naran
কমরু—Kamaru [দুদিন]
ৎসম্ভে দম প (ছাম্বে দম প) – Tsambhe dam pa [সাত দিন]
হিন্দুতম (হিন্দুস্থান)—Hindutam
নুরুপু থেকে ঘোৎসোরক (আগেরবার বলা হয়েছে ঘোরৎসোরক) পর্যন্ত আগের মতো একই পথে—From Nurup'u as before upto Gotsoraka
কাশ্মীর থেকে বয়ে আসা বড় নদী—big river from Kashmir [পনেরো দিন]
হিল—Hila [তিন দিন]
মুরগ নদী—Murag river [তিনদিন]
ৎসোশর—Tsośara
ধোধোষ্ণ—Dhodhoṣna
ববুল—Vavula [দুইদিন]
মলোট্ট—Malotṭa [২ + ৯ দিন]
লবণ হ্রদ—Salt lake [তিন দিন]
রুকাল—Rukāla
অক্কিথিয়ল—Akkithial
ভহপুর—Bhahupur
মালপুর—Mālapur
উৎসলপুর—Ut'salapur
সপুনপুর—Sapunpur
রেউরেট—Reuret
অতিকে – সিন্ধু (সিন্ধু নদ তীরস্থ অতোক)—Atike – sindhu
ম-ৎসিল-ক-নথ-ত্রিল—Ma-ts'il-ka-natha-tril
পোর—Pora
নোশর—Nośara
মতঙ্গন—Mataṅgana
মিতপাণি—Mitapāṇi
মাধ—Madha
অৎসিমি—Atsimi
পকশিলি—Pakśili
ধমধোরি – Dhamdhori
কিটুহর—kiṭuhar
ভঠুরবর—Bhaṭhurvar
পঠপঙ্গে—Pathapaṃge
মুতদ্নি—Mutadni
কপোল—Kapola
কন্ধহর—Kandhahar
হসোনগর—Hasonagar
পরুক—Paruka
নসভল—Nasabhala
সিক'ইর—Sik'ir
মোমোলবজ্র—Momolavajra
সিথর—Sithar
ভয়সহুর—Bhysahura

হসোনগর (দ্বিতীয়বার)—Hasonagar again

পরুব (আগের বার পরুক)—Paruba (before : Paruka)

ন্যপল—Nyapala

অপুক—Apuka

কিল্লিতিল—Killitila

সিকির—Sikir

মোমোলবজ্র—Momolavajra

সিনোর—Sinora

পেলহর—Pelahar

মুথিল্লি—Muthilli

মুসম্বি—Musambi

মুথিক্ষি—Muthiksi

মহাতিল্লি—Mahatilli

সলাহুলদা—Salāhulda

কলভ্যৎসি—Kalabhyatsi

সঙ্গিলধুব—Sangiladhuba

গোঠৈয়শকম—Goṭhaiaśakam

গিরিপথ—Pass [তিনদিন]

দ্সোমকতি বা যমকটি—Dsomak'ati [পাঁচদিন]

(অরগ্যানের সব নদীর সঙ্গমস্থল)

য়লোম পেলোম—Yalom pelom [পাঁচদিন]

করকশর—Karakśar [তিন দিন]

রায়িশর—Rāyiśar [তিন দিন]

রহোরভ্যর (মঙ্গলয়োর)—Rahor-bhyra (Mangalaor)

রায়িশর (দ্বিতীয়বার)—Rāyiśar again [একদিন]

ও ডি য়া ন (ধূমতাল)—Odiyana (Dhumtala)

কমলবীর পর্বত—Kamalabir mountain

মঙ্গল পানি—Mangala Pani

ওড়িয়ান (দ্বিতীয়বার)—Oḍiyāna again

রায়িশর (তৃতীয়বার)—Rayis'ar

মিদোর—Midora

করগ্‌সর—K'aragsar

সধিভোর—Sadhibhor

কবোক—Kavoka

ভ্যৎসভসঃসোর — Bhyatsabhasa-bhasor [পাঁচ দিন]

সিন্ধু নদ—Sindhu

রদসহুর (র জ হু র)—Radsahura (Rajahura) Not far from Atike [দুই দিন]

নীল—Nila

কমথে—Kamthe

নেপলে—Nepale

নিলউ—Nila'u

লঙ্ক—Lanka

হোরঞ—Horaña

অসকম্নি—Asakamni

মহৎসিন্ধে—Mahatsindhe

ঘেলম্রি—Ghelamri [ছয় দিন]

ঘোরশল—Gorśala [দুই দিন]
কল্প—Kalpa
রুকাল—Rukāla
রহরবুণ্ড—Raharbuṅḍa
রবত—Ravata
সতা—Satā
হতি (হাতি ?)—Hati
ৎসিরু—Tsiru
রুতা—Ruta
জেলোম (ঝিলম)—Dselom
সর—Sara
ভেবর—Bhebar
নোশর—Nośara
রৎসুগ—Ratsuga [তিন দিন]
লিথন—Lithana
পিরবঞ্চৎস—Pirbañtsa [দুই দিন]
কাশ্মীর—Kashmir
বরন—Varan
মটে—Maṭe [দশদিন]
জন্সদকর—Zansdkar
মরিয়ুল বা লাডাক—Mariyul

শব্দসূচী

অটিক—৭৮
অপুক—৮৩
অবন্তীপুর—৩৭
অভের—৭৬
অরগ্যান (উড্ডান, উরগ্যান)—১, ৯, ১১, ২২, ২৪-২৭, ৩৩, ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৬৫, ৭৩, ৭৬, ৮২-৮৪, ৮৭, ৮৮, ৯০
অরগ্যান পা'—১-৪৬, ৫০, ৫৮, ৬৪, ৬৯, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৮৭, ৮৯
অরগ্যান পা' নগ দ্বন দ্গ্যমৎসো—৯০
অহ্ৎ নি-ম-গু-পা'—৬৯
অলবেরুনী—৪৩, ৪৮
অশোক—৬৩
আকবর—৯০
আমীর খসরু—৩৭
আরূপানি—৮৮
ইন্দ্রনীল—১৯, ২০
ইন্দ্রভূতি—১৫, ২৬, ২৮, ৩৩
ইবন বাতুতা—৪৯
ইলতুতমিশ—৪৯, ৫০, ৬৪
ইৎসিঙ—১৩
উড্ডান বা উড্ডীয়ান বা উদ্দিগ্রাম—১, ১৪-১৬, ২৩, ২৬, ৫০, ৭৯, ৮৩, ৮৬-৮৯ এবং অরগ্যান দেখুন
উরগ্যান—অরগ্যান দ্রষ্টব্য
উরশর বা উরশা—৩৪, ৩৫
উলার (হ্রদ)—৩৬
উৎসুলপুর—৭৮
ওকোস—৩২, ৬৮
কঙ্করকোট—৬৬, ৬৮
কচোক (কবোক)—২২, ২৪, ২৫, ৩১, ৮৮
কজ্জল—৩৭, ৪৭
কঠুহর—৬৮, ৭৪
কণ্টকারি—২২
কণিষ্ক—১২
ক-ম-কু-লদন-সর—৫৮
কমথে—৮৯
কমরু—৭৪
কমলবির—৮৭
করকশর—৮৫, ৮৮
ক রাগ পা'—৫২
কলবুর—২৩
কলভ্যাংসি—৮৪
কয়ুঙ লুঙ—৬৫
ক্যগস—৬৬
কাবুল—৪৮
কিল্লিতিল—৮৩
কুবলাই খান—৪৬
কুলু (কুলুত)—৩, ১৭, ৬০, ৬১, ৭৩
কৈলাস পর্বত (তি সে)—২, ৩, ২২, ৫১, ৬৫
কোদস্তর—২৫
কোলোফান—৯০
গঙ্গা—৫১
গজনী—৪৮
গ্দন দমর—১
গন্ধোল বা ঘটলি—১৯, ৫৩, ৬১, ৭৩
গরতিল—৬৮
গর-শ—লাহুল দ্রষ্টব্য
গ্সল স্তোন—১১
গ্রগ্স পা' রগ্য মৎসো—৬৫, ৭১
গিয়াসুদ্দীন—৩৭

গুগে—৫১, ৬৫
গুরলা মান্ধাতা—৩
গুস মণ্ডল—৭৩
গৃধ্র—১৭
গো-পা-ল—৪৬
গো লুন—১০
গোম্বুরী—৩১
ঘজনা—গজনী দ্রষ্টব্য
ঘোদসার—২১
ঘোর্তসোরক—৬৮, ৭৪
ঘোরশাল—৭৬, ৮৯
চন্দ্রভাগা নদী—১৯
ছাম্ব (উপত্যকা)—৪, ৫৩, ৫৫, ৬৬
জওজুও—৫১, ৫২, ৬৫
জওসদকর বা জন্সকর—২৩, ৭১, ৭২, ৯০
জালন্ধর—১৫, ১৭, ১৮, ২১, ৪৫, ৫০, ৫৬, ৬০, ৬৬, ৬৭, ৭৪
জাহাঙ্গীর—৯০
জ্ঞাননাথ—৮১
জি ব র্নম রগয়াল—৭৪
জুর ৎসো—১০
ঝিলম—২১, ৩৭
তকলাকোট—১
তসন উর স্গরোগস প—৮১
তি সে—কৈলাস পর্বত দ্রষ্টব্য
তূপল ইয়ে—১, ৫, ৬, ১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৮, ২৯, ৩২-৩৪, ৪২-৪৪
দসা পীর—৬৮
দসিন পীর—৬৮
দর-মু—৭৩
দ্রঙ পো বজঙ পো—৬৫, ৭১
দির (শহর)—১৭
ধগন—৭৬, ৮৩
ধুমনথু—৩২
ধুমতাল—২৪, ২৮, ৩২, ৩৩, ৮৮
ধেংকুর—২১
ধোদোঞ্চ—৭৬
নগরকোট, নাগ-কো-এ—১৮, ৫৭, ৬৬, ৬৭, ৭৪, ৭৬
নরুপু—৬৮, ৭৪
নসভল, স্থপল—৭৯, ৮৩, ৮৪
নাগার্জুন—৬০, ৬৬
নামগয়াল—৬৬
নালন্দা—১৩, ৬২
নীল—২১, ৮৯
নোগোদর—৩৭
নোসর—৬৮, ৭৪, ৭৮, ৮৯
প-গ-মু—৫৮, ৫৯, ৬৭
পঞ্চ সাধনা—৫২
পঠন—৬৮, ৭৪
পঠন মুস্থর—৬৮, ৭৪
পতুরর—৬৮, ৭৪
পদ ম ধ্ কর পো—৪৬
পদ্মসম্ভব—৯, ১৪, ১৫, ২৬, ৬২, ৭৮, ৮৫
পমপুর—৩৭, ৬৯, ৮৯
পর্তসগয়—৮৪
পরুক, পরুব—৮৩, ৮৪,
পরুর্দ—৬৮
পলহর সগঙ—৭০
পশই—১৭, ২৮
প্র-মেন-ম—২৮
পাদশিলি—৭৮, ৭৯
পালনাথ—৮৩-৮৯
পু—৬৬
পু রঙস—১
পুরসো—২২
পুষ্পহরি—৮৯
পেলহর—৮৪

প্রেতপুরী—৬৫
ফা-হিয়েন—১৬
ব্‌ক র গুদ পা' (সম্প্রদায়)—১
বজ্রকায়—৪, ৭৩, ৭৪
ব্‌দে ব রগ্য মৎসো—৭২
ববুল—৭৬
বরন—৮৯
বরমিল বা ভ্ররমিল—২০, ৭৪
বরাহমূল বা বরমূলা—৩৬, ৭৪
ব্‌সম গিলিঙ পা'—১১
ব্‌সোদ ওদ পা'—১১
ব্‌সোদ নমস রগয়াল ম্‌ৎস অন দ্‌পল বজন পো—৭২, ৯০
ব্রহোর (ডহোর)—৭৫
বাদাকশান—১৭
বিক্রমশীলা—১৩
বিতস্তা—২৫, ৩৬
বি-ৎজি-ক্র-ম (বিচিত্রবর্মা)—৫৫
বুদ্ধ—৬৮
বুদ্ধগয়া—৪৬
বুদ্ধনাথ—৮০, ৮৩
বো-দঙ—১১
ভইয় শহুর—৮০
ভট্টারিকা, আর্য—১৮, ৩২, ৫৮, ৫৯
ভরগু—২৫
ভ-রো-ম-ৎসি—৭০
ভিকরোভস—২৪
ভিরস্‌মস বা ভিরমশাল—৩২
ভুজদেবী—২২
ভেজিভর—৩৭
ভেটসরভুর—৬৮, ৭৪
ভোনেলে—২৫
মইয়ঙ পো রদসঙ—৬৫
মকন-পো—১১, ৪৪
মণ্ডলয়োর—২৬
মঙ্গলপাণি—৩২, ৮৮
মঙ্গলহোর—৮৬
ম্‌তো লিডঙ—৫২
ম্‌দোস্‌দে দ্‌পল—১০
ম-পম বা মান সরোবর—১-৪, ৫১
মরু বা ছাম্ব দেশ—৩, ১০, ১৭, ৫৩, ৭৬
মহাতিল্লি—৮৪
ম-ৎসিল-ক-নথ-ব্রিল—৭৮
মারকো পোলো—১৭, ২৮, ৩৭, ৫০
মালিক করদরিন—২১
মলোট্র বা মলোট বা মালকোট—২১, ২২, ২৪, ৭৬
মাহমুদ, সুলতান—৪৮, ৪৯
মাহেন-জো-দরো—৬৩
মিঠাপানি—৭৮
মিতগ্র্‌প—১৮
মি-বক্র-স-রো—৫৯
মুজফ্‌ফরাবাদ—৩৫
মুথিকৃসি—৮৪
মুথিল্লি—৮৪
মুসম্বি—৮২
মোমোলবজ্র—৭৯, ৮৩, ৮৪
যমীন-অদ্দোলা মাহমুদ—মাহমুদ দ্রষ্টব্য
রকস সরোবর—৩
রগদ তসঙ পা'—১০, ৪৪, ৪৭-৬১, ৬৭
র্‌গদ ৎসিন পা'—১১
রগ্য স্ক্যগস—১৯
রজহুরা—২২, ২৩, ৩৪, ৮৯
র্‌দ সোঙ—৭৩
র্‌দোরজেমুল—২৬
র্‌নম র্‌গয়াল—৭৭
রশ্মিশ্বরী (রামেশ্বর)—৩৫, ৩৬
রস পা'—স্তাগ তসঙ রস পা' দ্রষ্টব্য
রম্বিকর—২৬, ২৮, ৩৩
রহোরভ্যয়র—৮৬

রানম-রি-শ্রোণ-বস্তান—১২
রামপাল—৪৬
রামেশ্বর—৬৯
রাম্বিশর—৮৫, ৮৬, ৮৮
রিন চেন দ্পল- ১১
রিন রংসে—১১
রুকল—২২, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮৯
রেউরেট—৭৮
লক্ষ্মণদেব—৩৭
ল-গু-র—৫৮, ৫৯
লগুগুরা—১৮, ৬৭
লহ্ বত সান—৫২
লাডাক—২৩, ৪৫, ৪৬, ৯০
লাভা-পা'—২৭
লাহুল—৫২-৫৪, ৬১, ৭২, ৭৩
লিথন—৮৯
লোটসাব—৫৩, ৫৫, ৫৭
শতদ্রু নদী—৩, ৫১, ৬৫
শম্ভুনাথ (সোমনাথ)—৮১
শি-তি-স-র—৫৯
শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর—১৪, ৫১
শ্রীনগর—৬৮ ৭০
শ্রী পর্বত—৩২, ৩১
সইডু—৮৫
সকিরি—৬৮, ৭৪
স্গ্রোল ম—৭০, ৯০
সঙ্গিলধুব—৮৪
সদিভোর—৮৮
সবুক্তগীন—৪৮
স্বুদ বক্র—৪৪
সম্বর—৫৮
সরঙ লা—৬৫
সলউ—৬৮, ৭৪
সলকোঠ—৬৮, ৭৪
সলাহলদা—৮৪
সলুস্ত পুচ—৩১
স্কল ব্জনসগ্রোল ম—সগ্রোল-ম দ্রষ্টব্য
স্পণ্ডপুর—পমপুর দ্রষ্টব্য
স্যাগ তসঙ বস পা'—৬২-৯০
স্তাগ-সিলিম (তখত-ই-সুলেইমন—৭০
স্বাত বা সুবাস্তু নদী—৫০, ৬২
সান্দব্রার—৭০
সিকির—৭৯, ৮৩, ৮৪
সিথর—৮০
সিদ্ধপুর—২৫
সিন্ধু নদ—২৩, ২৪, ৫০, ৫১, ৭৮, ৮৯
সিল বা হিল—২০
স্পিটি—৫২
সু-গে-তঙ—৬৬
সু-লু—৫৪
সেঙ গে ব্গয়াল—৯০
সেন গে র্নম ব্গয়াল—৯০
সেনতা—৭০, ৭১, ৮৯
সোট—৬৮, ৭৪
সোমা দেবী—২২
স্লোব দ্পোল—১১
হুসোনগর—৭৮, ৭৯, ৮২, ৮৩
হিউয়েন-সাঙ—১৬, ২৬, ৩৭, ৬৩, ৬৯
হি-লো—২৬
হুদস্নাথ—৮৭
হুলাহু—২২, ৭৬
হেতান—২০
হেবজ্র—৫৮
হ্লোম-পেলোম—৮৪, ৮৫
ৎসি-ক্রো-ত—৩৫
ৎসিরু—৮৯
ৎসে রিঙ দ্পল লদে—৭২
ৎসে রিঙ ম্গয়াল পো—৭২
ৎসোশর—৭৫, ৭৬
ক্ষেত্রপাল—৪, ৯, ৩২